ক্যানসার গবেষণার প্রেক্ষাপট

সুকুমার সাহা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

ক্যানসার গবেষণার প্রেক্ষাপট

সুকুমার সাহা বি. ভি. এস্. সি. অ্যান্ড এ. এইচ.
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

CANCER GABESHANAR PREKSHAPAT

[*PERSPECTIVE OF CANCER RESEARCH*]

Sukumar Saha

প্রকাশকাল :

প্রথম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯০/সি

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যানসন (নবম তল)

৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :

শ্রী প্রবীরকুমার পান

শ্রী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস

২০৯বি, বিধান সরণী

কলিকাতা ৭০০ ০০৬

মূল্য : সাত টাকা

Published by Shri Shibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

উৎসর্গ

মা ও বাবা

ভূমিকা

'ক্যানসার গবেষণার প্রেক্ষাপট' বইটি চলতি বাংলায়, সহজ সাধারণ ও সাবলীল ভঙ্গিমায় লেখা। বইটি সর্বসাধারণের জন্যে উপোযোগী। বইটি কোন একটি ডাক্তার উকিলের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই যে কোন একটি ঘরের বধূ বা কৃষকের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বইটি লেখার জন্যে শ্রী সমর রায়চৌধুরীর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। ডাঃ অমিয় কুমার হাটির 'ক্যানসার' থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বইটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডাঃ হাটির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল। চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ সেণ্টার ও ঠাকুরপুকুর ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার বইটির তথ্য অনেক জোরদার করেছে। সর্বোপরি বইটি প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ'কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সুকুমার সাহা

সূচীপত্র

ক্যানসার গবেষণার প্রেক্ষাপট

ক্যানসার গবেষণার প্রেক্ষাপট

(১) ক্যানসারের ইতিহাস ঃ

আজকাল যে রোগটি আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের তা হল ক্যানসার। এর পরই সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস এবং করোনারি থ্রম্বোসিস। গত দশবছর ধরে চালানো সমীক্ষার ফল থেকে জানা গেছে, মানসিক শ্রমে নিযুক্ত মধ্যবিত্তদের (যেমন—ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, ব্যাঙ্কের কেরানী ও ব্যবসায়ী ইত্যাদি) মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ কমে আসছে, বাড়ছে হৃদরোগ ও বহুমূত্র ; সঙ্গে বাড়ছে ক্যানসার। বিজ্ঞান মহলকে এখন যে রোগ সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে, যে রোগ বিশ্বের সকলেরই ভয়ের কারণ তা হল ক্যানসার। ক্যানসার (Cancer) শব্দটি ভারতীয় নয়। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ক্যানক্রাম (Cancrum) থেকে। হিপোক্রেটিস (Hippocrates) রোগটির নাম রাখেন কার্কিনস (Karkinos)। গ্রীক শব্দ কার্কিনোমা (Karkinoma) এসেছে কার্কিনস থেকে, যার অর্থ কাঁকড়া (Crab)। সংস্কৃতে যাকে আমরা কর্কট বলে জানি। ক্যানসারকে ইংরেজিতে কার্সিনোমা (Carcinoma)-ও বলে। আর ক্যানসার সম্পর্কিত বিজ্ঞান অনকোলজি (Oncology) নামে পরিচিত।

(২) ক্যানসার বলতে কী বোঝায় ঃ

দেহের কোন স্থানের অনিয়মিত ও অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধির ফলই ক্যানসার। কোষগুলো আকার ও আয়তনে ভিন্ন। তাদের কার্যাবলীও সাধারণ কোষের মত নয়। ক্যানসার কোষের আরও একটি বিশেষত্ব হল, এরা অতিদ্রুত নিরর্থকভাবে বাড়তে থাকে। ক্রমে কোষগুলো টিউমারের রূপ নেয়। এই ধরনের অসমবৃদ্ধি বেশি দেখা যায় পরিণত বয়সে যখন জনন ক্ষমতা প্রায় লুপ্ত, স্তিমিত। প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসে টিউমার সৃষ্টিকারক উদ্দীপনার কোন মূল্য নেই। মনে রাখা দরকার, টিউমারের বৃদ্ধি নববৃদ্ধি (neoplasia) সাধারণ বৃদ্ধি নয়। তাইতো টিউমারকে আমরা নবকলায়ন (neoplasm) বলেও জানি। টিউমার দু'ধরনের—নির্দোষ বা বিনাইন (Benign) ও মারক

বা ম্যালিগন্যান্ট (Malignant)। এর মধ্যে পরেরটিকেই আমরা ক্যানসার বলি। নিচে নির্দোষ ও মারক টিউমারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হল—

১. নির্দোষ টিউমার-কোষের নিউক্লিয়াসে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। অন্যদিকে মারক টিউমারে এ পরিবর্তন খুব বেশি। এর কোষগুলো অতিরিক্ত মাত্রার DNA-র দরুন অতিরঞ্জী বা হাইপারক্রোমাটিক (hyperchromatic)। এখানে নিউক্লিওলাসটিকেও বেশ বড় দেখায়।

২. নির্দোষ টিউমার কোষে সাইটোপ্লাজম অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু মারক টিউমারে নিউক্লিয়াস অনুপাতে সাইটোপ্লাজম কমে যায়।

৩. কোষগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। পৃথগভবন সম্পূর্ণ হয়। আর মারক টিউমারে পৃথগভবন হয় না।

৪. নির্দোষ টিউমারে কোষগুলি সাজানো। পরস্পর সমতলের সাথে লম্বভাবে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোষগুলি একেবারে সাজানো নয়, লম্বভাবেও থাকে না—তালগোল পাকিয়ে থাকে।

৫. প্রথম ক্ষেত্রে কোষগুলি মৃদু ও ধীর গতিতে সংখ্যায় বাড়ে। অপ্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন (mitotic division) হয় না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোষ খুব দ্রুতগতিতে সংখ্যায় বাড়ে। অপ্রত্যক্ষ কোষবিভাজন পদ্ধতি লক্ষ্যণীয়।

৬. নির্দোষ টিউমার দেহের দূরবর্তী যন্ত্রসমূহে কখনো ছড়ায় না। মারক টিউমারের বৈশিষ্ট্য দেহের দূরবর্তী যন্ত্রসমূহে ছড়িয়ে পড়া। তার নাম কোষ স্থানান্তরণ বা মেটাস্টিসিস।

৭. নির্দোষ টিউমারের ক্ষেত্রে পুনরাক্রমণ-এর ঘটনা খুব কম। আর মারক টিউমারের ক্ষেত্রে প্রায়ই পুনরাক্রমণ হয়।

৮. আরোগ্যের সম্ভাবনা মারক টিউমারের ক্ষেত্রে খুব কম; নির্দোষ টিউমারের ক্ষেত্রে খুব ভালো।

এমন কি মারক টিউমার কোষের নিউক্লিয়াসের সংখ্যারও কোন স্থিরতা নেই। ক্রোমোজোমের বেলাতেও ঐ একই কথা। যেমন, ধরা যাক আমাদের পরিচিত নেংটি ইঁদুরকে। এদের সারকোমায় (sarcoma) ৮৫টি ক্রোমোজোম থাকে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় থাকে মাত্র ৪০টি। এছাড়া কোষে সাইটোপ্লাজমের অংশ কমে যায়। নিউক্লিয়াস বড় দেখায়। এমনকি কোষ মধ্যস্থ ক্রোমাটিন জালিকা (chromatin network) শুধু মোটাই নয়, অনিয়মিত দেখায়। নিউক্লিও-লাস বড়। স্বাভাবিক কোষগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসলে তাদের বিভাজন

বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বৃদ্ধিও দমে যায়। কিন্তু ক্যানসার কোষগুলি পরস্পরের

আকৃতিগতভাবে বিভিন্ন ধরণের টিউমার কেমন হয় তা ছবির মাধ্যমে দেখান হল :
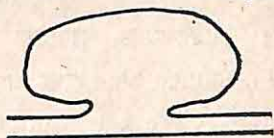
1. গুটির মত (Wart like)

2. ভিলাস (Villous)

3. শিঙের মত (Horn like)

4. প্যাপিলোমেটাস (Papillomatous)

5. ব্যাঙের ছাতার মত (Fungoid)

6. স্পিনাস (Spinous)

7. পলিপয়েড (Polypoid)

8. বর্ধিষ্ণু (Expansive)
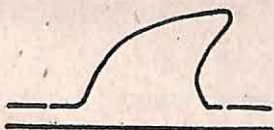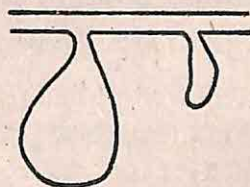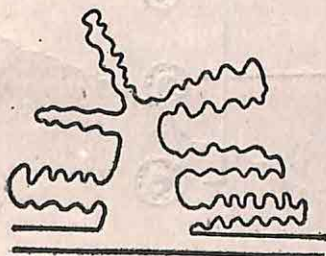
9. অনুপ্রবেশকারী (Infiltrative)
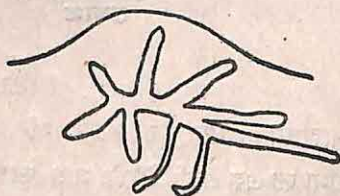
চিত্র নং ১

যতই কাছাকাছি থাকুক না কেন, বৃদ্ধি চলবেই।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা ক্যানসার গবেষণায় নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁদের আবিষ্কার এই ভয়াবহ রোগের গবেষণায় অনেকটা অংশ জুড়ে। এরকম কি কখনো কল্পনা করা যায় যে, একটি ইঁট ভাল না হওয়ায় বহুতল প্রাসাদও ভেঙ্গে পড়েছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ক্যানসার ক্ষেত্রে কিন্তু তাই ঘটে থাকে। তাঁদের মতে, মানুষের শরীরে কোটি কোটি কোষের মাত্র একটির ক্ষতিই ক্যানসারের কারণ হতে পারে। শুধু কি তাই? মার্কিন গবেষকরা স্বাভাবিক কোষের সঙ্গে ক্যানসার কোষের কাঠামোগত পার্থক্যও তুলে ধরতে

ক্যানসার-এর ছড়িয়ে পড়ার প্রকৃতি ছবিতে দেখান হল :
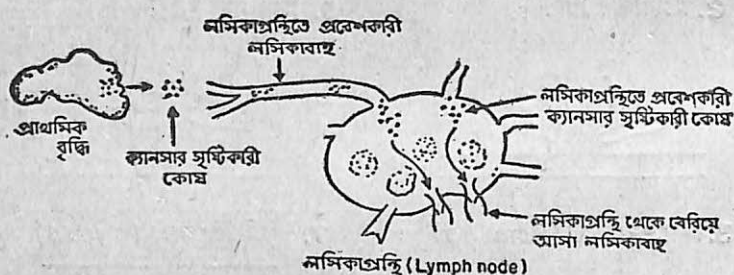
চিত্রনং ২

ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি বেশ অনিয়মিত, ছবিতে এর প্রকৃতি দেখান হল :
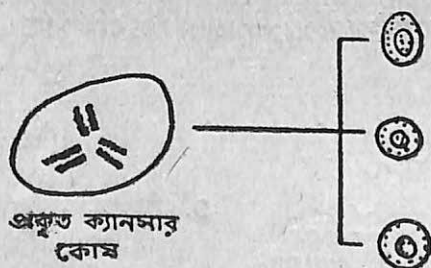
চিত্র নং ৩

পেরেছেন। মানুষের শরীর যদি একটি প্রাসাদ হয়, তবে তার প্রতিটি কোষ প্রাসাদের এক একটি ইঁটের সঙ্গে তুলনীয়। শুধুমাত্র একটি কোষের ক্ষতিই যে ক্যানসারের কারণ হতে পারে, বিজ্ঞানীরা এতকাল তা জানতেন না। ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজির নয় জন বিজ্ঞানীর একটি দল

গবেষণাটি চালিয়ে ছিলেন। তাঁদের সাহায্য করেছিলেন আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট। আনন্দের কথা, মার্কিন বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীও ছিলেন। নাম রবি ধর। স্বাভাবিক কোষ ও ক্যানসার কোষের পার্থক্য নিরূপণে ভারতীয় বিজ্ঞানীটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

মারক কোষের বিভিন্ন ধরণ ঃ

১। **সংযোগ কলার মারক টিউমার** (Malignant connective tissue tumour)

ক. **সারকোমা** (Sarcoma) ঃ এই ধরনের মারক টিউমারে স্হিত ভ্রূণকলার বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়।

খ. **অস্টিও সারকোমা** (Osteosarcoma) ঃ আগে এর পরিচিতি ছিল মায়েলয়েড (myeloid) সারকোমা বা জায়াণ্ট (Giant) সেল সারকোমা নামে। এরা অস্থি, বিশেষ করে দীর্ঘাস্থির সঙ্গে বাড়ে।

গ. **মেলানোমা** (Melanoma) ঃ এই মারক টিউমারে কোষে বাদামী লৌহমুক্ত রঙ্গক থাকে যাকে আমরা মেলানিন বলে জানি। কোষগুলিই মেলানিনের সৃষ্টিকর্তা। মেলানোমা দেখা যায়—চামড়া, চোখ ইত্যাদি অঙ্গে মেলানিন থাকে প্রচুর মাত্রায়।

২। **আচ্ছাদক কলার মারক টিউমার** (Malignant epithelial tumour)

ক. **কার্সিনোমা** (Carcinoma) ঃ এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আচ্ছাদক কলাকোষ (epithelial cell) এবং সংযোগ কলার একটি অংশ (stroma)।

খ. **শল্কসদৃশ বা স্কেয়ামাস সেল কার্সিনোমা বা স্কেয়ামাস এপিথেলিওমা** (Squamous celled carcinoma on squamous epithelioma) ঃ এই মারক টিউমার স্তরীভূত শল্ক (stratified squamous) দ্বারা আচ্ছাদিত। জিহ্বা, মুখ, পায়ু, পুংজননাংগ, গলবিল, যোনি ইত্যাদি স্থানে এই ধরনের ক্যানসার হতে দেখা যায়।

গ. **ভিত্তি-কোষ বা বসালসেল কার্সিনোমা ঃ** (Basal cell carcinoma) ঃ সাধারণত দেখা যায় জীবজন্তুতে বিশেষ করে ঘোড়া ও কুকুরে।

ঘ. **গ্রন্থিকোষ বা গ্ল্যান্ডুলার কার্সিনোমা ঃ** (Glandular carci-) noma) ঃ এর উৎস গ্রন্থি। ঘোড়া ও কুকুরের থাইরয়েড, ষাঁড় ও কুকুরের যকৃৎ, কুকুরের স্তনগ্রন্থি, প্রস্টেট ও ঘোড়ার বৃক্ক এই টিউমারে বেশি আক্রান্ত হয়।

ঙ. **শুক্রোমা বা সেমিনোমা** (Seminoma) ঃ কুকুরের অণ্ডকোষে এই মারক টিউমারের ঘটনা বেশ চোখে পড়ে।

চ. **এপিথেলিওমা** (Epithelioma) ঃ এর উৎপত্তি অন্তর্ঝিল্লী বা এণ্ডোথেলিয়াল কোষ (endothelial cell) থেকে, এই মারক টিউমার প্লুরা (ফুসফুসের আচ্ছাদক), পেরিটোনিয়াম (পাচনতন্ত্র ও জননতন্ত্রের আচ্ছাদক) রক্তবাহী নালী ইত্যাদি স্থানে হয়ে থাকে।

৩। ক্যানসার কোথায় হয় ও কী নাম ঃ

ক্যানসার কোথায় হয়? প্রশ্নটিই ভুল। প্রশ্নটি হওয়া উচিত জন্তু-জানোয়ার বা মানুষের ক্ষেত্রে ক্যানসার দেহের কোথায় কোথায় বেশি হয়? পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যানসার এই স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে স্তনের ক্যানসার (breast cancer) ও জরায়ু-মুখের ক্যানসারের প্রাদুর্ভাবই বেশি দেখা যায়। সামগ্রিক বিচারে মানুষেরই ক্যানসারই হয় সবচেয়ে বেশি। মানুষের পৌষ্টিকনালীর অন্ননালী বা গ্রাসনালীতে হয় অন্ননালীর ক্যানসার (esophagial cancer), পাকজনীতে হয় পাকস্থলীর ক্যানসার, বৃহদন্ত্রে হয় মলনালী (colon) ও মলাশয় (rectum)-এর ক্যানসার। এছাড়া যকৃতে হয় যকৃতের ক্যানসার, অগ্নাশয়ে অগ্নাশয়ের ক্যানসার (pancreatic Cancer), বৃক্কে বৃক্কের ক্যানসার। বৃক্কের ক্যানসার গ্রাউইট্‌ (grawitz) টিউমার নামে পরিচিত। একে বৃক্কের অ্যাডেনোকার্সিনোমা বা হাইপার নেফ্রোমাও বলে। মানুষের মূত্রাশয়ের ক্যানসারের ঘটনাও খুব বিরল নয়। মূত্রাশয়ের ম্যালিগন্যান্ট টিউমারগুলির কয়েকটির নাম করলে ম্যালিগন্যান্ট প্যাপিলোমা, নডিওলার কার্সিনোমা, কার্সিনোম্যাটাস আলসার, অ্যাডেনো কার্সিনোমা ও এণ্ডোমেট্রিওমা ইত্যাদির কথাই বলতে হয়।

এখানেই শেষ নয়। এবার বলি মানুষের জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ক্যানসারের কথা। পুরুষের ক্ষেত্রে প্রস্টেটের ক্যানসার, পুরুষাঙ্গের ক্যানসার মোটামুটি চোখে পড়লেও শুক্রাশয়ের ক্যানসারের ঘটনা নিতান্তই কম। পুরুষাঙ্গের ক্যানসারের প্রায় সবই আচ্ছাদক বা আবরক কলার ক্যানসার। এটি দু'ধরনের—পিড়কারূপী বা প্যাপিলিফেরাস (Papilliferous) ও ক্ষতরূপী বা অ্যালসেরাটিভ (ulcerative)। এদিকে শুক্রাশয়ের ক্যানসারও দু'ধরনের - ভ্রূণকোষ গঠিত টেরাটোমা (teratoma) ও শুক্রকোষ গঠিত

সেমিনোমা (Seminoma)। এবার আসা যাক স্ত্রীজননতন্ত্রের কথায়। স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় ও জরায়ু মুখের ক্যানসারের কথাই বেশি শোনা যায়। এছাড়া জরায়ুদেহের ক্যানসারের কথাও যে শোনা যায় না, তা নয়। তবে তুলনামূলকভাবে কম। কোরিও কার্সিনোমা নামেও এক ধরনের মারক টিউমার হয় মেয়েদের জরায়ুর ভিতরের গহ্বরে। এটি ছোট, শক্ত ও ক্ষণভঙ্গুর।

মাথা ও গলার ক্যানসারও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিতে বিরল নয়। বিভিন্ন দেশে এর প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। ঠোঁট, জিভ, স্বরতন্ত্র, মুখের ভিতরের ঝিল্লি, মুখবিবরের অন্যত্র, দাঁতের মাড়ি, গলবিল, লালাগ্রন্থি প্রভৃতির ক্যানসারকে মাথা ও গলার ক্যানসারের আওতায়ই ফেলা হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যানসারও গলার ক্যানসারের সীমানায় সীমাবদ্ধ। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যানসারের প্রকৃতি বিচিত্র। যেমন—পিড়কাকার ক্যানসার, ম্যালিগন্যাণ্ট্ অ্যাডেনোমা, অ্যালভিওলার কার্সিনোমা ইত্যাদি। এমনকি থাইরয়েডের বহুপুষ্টি বিশিষ্ট গলগণ্ডেও (multinodular goitre) হঠাৎ পরিবর্তন আসলে গৌণভাবে সেটি মারক টিউমারের রূপ নিতে পারে। এ ছাড়া এতে শক্ত ধরনের আদিকোষান্তরিত অ্যানাপ্লাসটিক স্কিরাস কার্সিনোমাও হতে পারে।

বড়দের মতো শিশুদের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্যানসারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই-ই নয়, কোমলকলার সারকোমা, আদিস্নায়ু কোষ গঠিত নিউরোব্লাসটোমা, বৃক্কের আদিকোষ গঠিত টিউমার বা নেফ্রোব্লাসটোমাও দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে যে টিউমার দেখা যায় সেগুলি মেডুলোব্লাসটোমা প্রকৃতির। আমাদের চোখেও এক ধরনের মারক টিউমার হয় যার নাম রেটিনোব্লাসটোমা। কম হলেও খুবই ভয়ঙ্কর। আমাদের অস্থিতে উদ্ভূত মারক টিউমারকে বলা হয় অস্টিওসারকোমা। এটি দু'ধরনের—অস্থিটিসু উদ্ভূত সারকোমা ও ইউইংস (Ewing's) বর্ণিত সারকোমা। এবার আমাদের খুবই পরিচিত কিন্তু এক অদ্ভুত প্রকৃতির ক্যানসারের কথা বলি। নাম—লিউকিমিয়া।

লিউকিমিয়া (Leukaemia) ঃ

এই রোগে শ্বেতরক্ত কণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocyte) সৃষ্টিকারী কলাতে অনিয়মিত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ শ্বেতকণিকার সংখ্যা রক্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে যার বেশিরভাগই অপরিণত। এর কারণ জানা

যায়নি ; যদিও অনেকে একে নবকলায়নের (neoplasia) আওতায় ফেলেন, কেউ দায়ী করেন বিশেষ ধরনের ভাইরাসকে। অস্বাভাবিকত্ব ছাড়া এদের গতির তীব্রতাও বেশ লক্ষ্যণীয়।

(৪) ক্যানসারের উৎপত্তি :

ক্যানসারের মূল কারণ কী ? সেই কারণগুলি থেকে কিভাবে ক্যানসার সৃষ্টি হয় ? কোন্ কোন্ পদার্থ ক্যানসার সৃষ্টিতে নিযুক্ত ? প্রশ্নগুলির সদুত্তর আজও মেলেনি। তবে কি বলা যায়, বিজ্ঞানীরা ক্যানসার গবেষণায় আমাদের এক ধাপও এগিয়ে দেননি ? দিয়েছেন, নিশ্চয়ই দিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন সমীক্ষা, পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্যানসার উৎপাদক পদার্থ অর্থাৎ কার্সিনোজেনের নাম আমাদের জানিয়েছেন ঠিকই, তবে ঠিক কিভাবে কারণগুলি ক্যানসারকে আমন্ত্রণ করে তার সদুত্তর আজও আমাদের জ্ঞানের আওতার বাইরে।

ক্যানসারের মূলকারণ অর্থাৎ কোষের উদ্দাম ও এলোমেলো বৃদ্ধির মূলে রয়েছে জীবকোষের প্রাণভোমরা ক্রোমোজোমের মূল রাসায়নিক উপাদান D N A-রূপরিব্যাপ্তি। ক্যানসারের দুটি উপাদান বা ফ্যাক্টর থাকা চাই। একটি বংশগত ইত্যাদি পূর্বপ্রবণ উপাদান বা প্রিডিস্পোজিং ফ্যাক্টর, অন্যটি প্রত্যক্ষ বা সুনির্দিষ্ট উত্তেজক উপাদান অর্থাৎ স্পেসিফিক প্রোমোটিং ফ্যাক্টর। অন্যান্য ফ্যাক্টরের মধ্যে কিছু পেশাগত। এই ফ্যাক্টরগুলিই ক্রোমোজোমের পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের জন্য দায়ী।

১. রাসায়নিক পদার্থের ভূমিকা :

শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের তৈরী ৫০০-র বেশি রাসায়নিক পদার্থ গবেষণাগারে ইঁদুর, কুকুর, বানর প্রভৃতির শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কোন রাসায়নিক বস্তু অন্য প্রাণীদেহে ক্যানসার সৃষ্টি করলেই যে মানুষের দেহেও একই কাজ করবে তার কোন ভিত্তি নেই। যেমন—পেনিসিলিন কোন কোন জন্তুতে ক্যানসার তৈরী করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এটি ক্যানসার সৃষ্টি তো করেই না বরং বর্তমান সভ্যতার একটি শক্তিশালী ওষুধ। সেই বিচারে মাত্র ২০টি বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ এ পর্যন্ত মানুষের ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে বলে জানা গেছে। প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা অনেক বেশি ; প্রায় ১৩৭টি।

ক. **কীটঘ্ন ঃ** গুদামজাত দ্রব্য যাত পচে না যায় সেজন্যে নানাধরনের রাসায়নিক দ্রব্য আমরা ব্যবহার করি। শস্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিই বিভিন্ন কীট নাশক। ১৯৭৯ সালের ১৫ই মার্চ-এ ইউ এস ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট জানিয়েছেন, কৃষিকার্যে কীটঘ্ন হিসেবে বহুল প্রচলিত টক্সাফেন নেংটি ইঁদুরের লিভার ক্যানসারের কারণ। মানুষের ক্ষেত্রেও সেটি কম বিপদজনক নয়। দীর্ঘমেয়াদী এক গবেষণার ফলে সেই সংস্থা এও জানিয়েছেন, অতিরিক্ত পরিমাণ টক্সাফেন যদি ধেড়ে ইঁদুর ও নেংটি ইঁদুর উভয়কেই দীর্ঘকাল ধরে খাওয়ানো যায় তবে তাতে এদের পুরুষদের ৯৮% এবং স্ত্রীদের ৬৯% কে ক্যানসারে আক্রান্ত হতে হয়। আবার সেই টক্সাফেনের অর্ধেক নিয়ে একইভাবে নেংটি ইঁদুরের ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, তাদের মধ্যে পুরুষদের ৬৯% স্ত্রীদের ১০% আক্রান্ত হয় সেই একই রোগে—ক্যানসারে। কীটনাশক হিসেবে DDT বহুল ব্যবহৃত। অতীতে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের হাতিয়ার বলতে যা বুঝতাম তাই এই DDT। কিন্তু বর্তমানে এর অপকারী ভূমিকা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গিয়েছে। তাই এর ব্যবহারও কমে এসেছে। DDT নেংটি ইঁদুরের দেহে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। নেংটি ইঁদুরকে ১৫ সপ্তাহ ধরে রোজ প্রতি কেজি ওজনে ৩৬ মিলিগ্রাম ডিডিটি খাওয়ালে যকৃতে টিউমার হতে দেখা যায়। কিন্তু ধেড়ে ইঁদুর, হ্যামস্টার ইত্যাদি প্রাণী দেহে আবার তা সম্ভব হয়নি। মানুষের দেহে কিছুদিন আগেও একে ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হয়নি। তবে সম্প্রতি জানা গেছে, DDT পরোক্ষভাবে মানবদেহেও ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। শরীরে DDT-র পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী এমন মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, লিভারের অসুখ, রক্ত চাপ বৃদ্ধি (HBP) ছাড়াও ক্যানসারও হতে দেখা যায়। DDT ইঁদুরের লিভার ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। এমন কি, তার জিনেরও পরিবর্তন ঘটাতে পারে। দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায় বলে DDT অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হলেও কতগুলো সমস্যা থেকেই যায়। এটা নদী, নালা, খাল, বিল ও পুকুরে অল্প অল্প করে জমতে থাকে। যথারীতি জলের সঙ্গে প্রবেশ করে ছোট ছোট শ্যাওলা ও শুককীটের দেহে। শ্যাওলা ও শুককীট হচ্ছে বড় বড় মাছের খাদ্য। সুতরাং মাছের শরীরেও এর প্রবেশ ঘটে। DDT শরীরের চর্বি জাতীয় পদার্থে সঞ্চিত হয় বলে গোরুর দুধ মাখন ও হাঁস মুরগির ডিম থেকেও আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। মায়ের দুধ থেকে DDT যায় শিশুর

দেহে। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশুর সঙ্গে মায়ের নাড়ির যোগ থাকে ; তার পুষ্টি আহরণ তাই স্বাভাবিক ভাবেই চলে মা-এর কাছে থেকেই। ভ্রূণ অবস্থা থেকেই সে DDT-র শিকার। গর্ভধারণের ২২ ঘণ্টা পর থেকে মা তাঁর গর্ভফুল-এর মধ্য দিয়ে শিশুর দেহে DDT সঞ্চারিত করতে পারেন।

খ. আলকাতরা, পিচ ইত্যাদি : আলকাতরা, পিচ, ক্রিয়োযোট, অ্যানথ্রাসিন তেল, আলকাতরার তেল, পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি চামড়া ও ফুসফুসে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে শেষেরটি সংযোগ মাত্রেই ক্যানসার উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে।

স্যার পার্সিভাল পট (Percival Pott) প্রথম লক্ষ্য করেন, আলকাতরা নিয়ে যে সব সাধারণ মানুষ কাজ করেন, তাদের চামড়ার ক্যানসার বেশি হয়। স্কটল্যাণ্ডের জেলেরা আলকাতরা মাখানো সুতো ঠোঁটে চেপে ধরে জাল মেরামত করতেন বলে এদের ঠোঁটে ক্যানসার বেশি হত। ঘটনাটির ১৪০ বছর পর ১৯১৫ সালে জাপানে ইয়ামাজীওয়া (Yamagiwa) নামে এক বিজ্ঞানী খরগোসের কানে ৬ মাস ধরে আলকাতরা মাখানোর ফলে তার কানে ক্যানসার হয়েছিল। সন্দেহ নেই আবিষ্কারটি যুগান্তকারী। আলকাতরায় থাকে বেন্‌জ্‌পাইরিন নামক হাইড্রোকার্বন। এর ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। গবেষণায় ১ : ২ : ৫ : ৬ ডাই-বেনজ্যানথ্রাসিন নামের আরও একটি হাইড্রোকার্বনও সংশ্লেষ করা গিয়েছে। ক্যানসার সৃষ্টিতে এর ভূমিকাও কম নয়। এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ হচ্ছে মিথাইল-কোলানথিন। মস্তিষ্কে এই রাসায়নিক পদার্থ প্রবেশ করলে মস্তিষ্কের টিউমার (গ্লায়োমা) দেখা দিতে পারে। লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল, গবেষণাগারে যে মিথাইলকোলানথিন তৈরী হয়, আমাদের শরীরে স্থিত কোলিক অ্যাসিডই তার উৎস। প্রসঙ্গক্রমে ক্যানসার সৃষ্টিকারী অন্য কতগুলি পদার্থের কথাও উল্লেখযোগ্য। সেগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম—নাইট্রোজেন মাস্টার্ড অর্থাৎ হাইলেমেন, এপক্সাইড, ডাই-মিথাইল যৌগ প্রভৃতি। মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) বিকিরণের (ionizing radiation) মতো এই নাইট্রোজেন মাস্টার্ডও ক্যানসার সৃষ্টি করে।

গ অ্যানিলিন রং : এটি মূত্রাশয়ের ক্যানসার প্ররোচক। এর কার্যকর প্রতিনিধি (active agent) হল বিটান্যাপথিলামিন। এতে কুকুর ও মানুষের মূত্রাশয়ের ক্যানসার হয়, কিন্তু ইঁদুরে নয়।

মাস্টার্ড গ্যাস থেকে হয় ফুসফুসের ক্যানসার।

ঘ. থোরোট্রাস্ট্ঃ এক্সরে ফটো তুলতে রেডিওলজির কাজে ব্যবহৃত থোরোট্রাস্ট্ থেকে হয় যকৃতের ক্যানসার। এমনকি ব্যবহারের বেশ কয়েক বছর পরও এর থেকে ক্যানসার হতে দেখা গেছে।

ঙ. বেঞ্জিডিন, বেরিলিয়াম ইত্যাদি ঃ আমাদের অতি পরিচিত বেঞ্জিডিনও মানুষের চামড়া ও ফুসফুসের ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। বেরিলিয়াম থেকেও ক্যানসার হতে পারে। আইসোপ্রোপাইল তেল নাকের ক্যানসারের জন্যে দায়ী। বিজ্ঞানীরা খনি থেকে নিষ্কাশিত অশোধিত খনিজ তেলও কার্সিনোজেনের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করেন নি।

চ. বেঞ্জোপিরিডিন ঃ লরেন্স বার্কেলের গবেষকগণ লক্ষ্য করেছেন, মানুষের বুকের এপিথেলিয়াম কোষকে যদি বেঞ্জোপিরিডিন নামক অ্যারোমেটিক যৌগে রাখা যায় তবে সেই কোষগুলো যৌগটিকে একটি কার্সিনোজেন এপোক্সি বেঞ্জোপিরিডিন-৭, ৮-ডাইঅল-এ রূপান্তরিত করে। যৌগটি কোষের DNA-র সঙ্গে সমযোজী বন্ধনে বা কোভ্যালেন্ট বন্ডে যুক্ত হয়ে স্তনের ক্যানসারের কারণ হতে পারে। প্রায় ২০ বছর আগে একটি পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে যে বেঞ্জোপিরিডিন ইদুঁরের স্তনের ক্যানসার সৃষ্টি করে। ব্যাটারি তৈরীতে ব্যবহৃত ধাতু ক্যাডমিয়াম থেকে প্রস্টেট গ্রন্থিতে ক্যানসার হওয়া আশ্চর্য নয়। এমন কি বিজ্ঞানীরা বাজারে বিক্রিত আলকাতরাজাত রঞ্জক, কেশরঞ্জক, সাইক্ল্যামেটকেও ক্যানসারের কারণ হিসেবে ধরেছেন।

তেজস্ক্রিয় রশ্মি ঃ বেশি পরিমাণ মহাজাগতিক রশ্মি বা পারমাণবিক বিকিরণে ক্যানসার হতে পারে। ইঁদুরের সারা শরীরে ৬৬০r এক্সরে প্রয়োগ করে নির্দোষ ও মারক দু'ধরনের টিউমার হয়েছে। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরও যারা বেঁচে গিয়েছিলেন, তারা অনেকেই লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। যারা পারমাণবিক বিকিরণের বেশি কাছাকাছি ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে লিউকিমিয়া প্রায় কয়েকগুণ বেশি।

ছ. পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন ঃ দূষিত বায়ু থেকেও আমাদের ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে। এটি নিশ্চিত যে পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন ক্যানসার সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। দ্রুত কলকারখানা বেড়ে উঠেছে। পারমাণবিক বিকিরণ বেড়েই চলেছে। ক্যানসার করতে পারে এমন অনেক বস্তুর অস্তিত্ব বাতাসে ধরা পড়ছে, শহরেতো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও।

জ. পলিমাররূপী উপজাত ঃ রান্না করার সময় যখন তেলকে উত্তপ্ত করা

হয় তখন তার বিয়োজনে কতকগুলো পলিমাররূপী উপজাত তৈরী হয়। এগুলো আমাদের প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে, একথাও জানা গেছে।

কার্সিনোজেনের কি আর অভাব আছে! নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর থেকে অশুদ্ধি হিসেবে যে তেজষ্ক্রিয় যৌগগুলি বেরিয়ে আসে সেগুলিও মানুষের দেহের পক্ষে কম মারাত্মক নয়। এর মধ্যে রেডিয়াম, প্লুটোনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই পদার্থগুলি সরিয়ে না দিতে পারলে ফল ভোগ করতে হবে আমাদেরই। যথারীতি তারা ছড়িয়ে পড়বে, বিষাক্ত করে তুলবে বাতাসকে। এই বিষাক্ত বায়ুমণ্ডল তখন শুধু আমাদেরই নয়, আমাদের ভবিষ্যত বংশধরের কাছেও এক ভয়াবহ রোগ, ফুসফুসের ক্যানসারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

২. ক্যানসার ও ধূমপান :

শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই ক্যানসারের জন্য দায়ী পরিবেশগত কারণ। আর এই পরিবেশগত কারণের ৪০ শতাংশ-ই দখল করেছে ধূমপান বা মাদকদ্রব্য সহ ধূমপান। অন্যান্য যে সব রোগের সঙ্গে ধূমপান প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত সেগুলি হল – করোনারি থ্রম্বোসিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হৃৎপেশীর পচন, পাকস্থলী ও ডিওডিনামের ক্ষত ইত্যাদি। ক্যানসার, বিশেষ করে ফুসফুসের ক্যানসার, বৃক্কের ক্যানসার ও পাকস্থলীর ক্যানসারের সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্কের কথা অনেকেরই জানা আছে। অবশ্য প্রথমটির সঙ্গে ধূমপান ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কযুক্ত বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ১৯৬৭ সালে জাপানি মৃত্যুর প্রাপ্ত খতিয়ান থেকে দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মৃত্যুর হার ধূমপানে বিরত ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশি—প্রায় ২২ শতাংশ। গত ২০ বছরে মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা যেমন বেড়েছে, তেমনিই বেড়েছে তাদের ফুসফুসের ক্যানসারে মৃত্যুর হার। কিছু বিজ্ঞানীর মতে, ধূমপানের সময় ও পরিমাণের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। সিগারেটের ধোঁয়াস্থিত হাইড্রোকার্বনগুলির কথা অনেকেরই জানা। সিগারেটে ৫০০ রকমের বিভিন্ন যৌগ (গ্যাসীয় সহ উপস্থিতির কথা জানা গেছে। কয়েকটির নাম করলে প্রথমেই বলা দরকার নিকোটিন, পিরিডিন বেন্‌জ্‌পাইরিন (Benzpyrene) বা সংক্ষেপে ব্যাপ (Bap), উদ্বায়ী অ্যাসিড, টার ও ফেনলিক পদার্থ, ফার-

ফিউরাল, অ্যাক্রোলিন এবং আরো কয়েকটি নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থের কথা। এছাড়াও তাতে থাকে পোলোনিয়াম ২১০, নিকেল ও ক্যাডমিয়ামের মতো মৌল পদার্থ। প্রথম দুটি মৌলকে ফুসফুসের ক্যানসারের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হয়। একটি সিগারেটে প্রায় ২-২½ মিলিগ্রাম নিকেল থাকে যার ২০ শতাংশই ধোঁয়ার সঙ্গে ফুসফুসে পেঁছে যায়। বেশি পরিমাণ নিকেল টিউমার সৃষ্টি করে। আর সিগারেট পোড়ে প্রায় ৯০০°C উষ্ণতায়। এটা ক্যাডমিয়ামের গলনাংককে ছাড়িয়ে যায়, ফলে ক্যাডমিয়াম সহজেই ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে ফুসফুসে পেঁছে যায়। সিগারেটের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক পদার্থটি হল নিকোটিন। এটি একটি স্বাভাবিক তরল অ্যালকলয়েড, পিরিডিন ও পাইরোলিডিন রিং-এর সংযোগে তৈরী। দেখা গেছে, সব সিগারেটেই গড়ে প্রায় ৬-১৪ মিলিগ্রাম নিকোটিন থাকে। সিগারে থাকে ১৫-৪০ মিলিগ্রাম। আবার তামাকে নিকোটিনের পরিমাণ ১·৫%। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে শ্বাসতন্ত্রে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে গৃহীত সব নিকোটিনই দ্রবীভূত হয় না। যাই হোক, একথা জানা গেছে যে নিকোটিন আমাদের ফুসফুস, গলা ও ঠোঁটের ক্যানসারের সঙ্গে যুক্ত। নিকোটিন স্বতঃক্রিয় (autonomous), এমন কি কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্রকে (CNS) উত্তেজিত করতে পারে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ধূমপানে বিরত ব্যক্তিদের চেয়ে ধূমপানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফুসফুস ও মুখে বেশি ক্যানসার হয়। সিগারেটস্থিত কার্বন মনোকসাইডের (Co) গড় পরিমাণ ২০ মিলিগ্রাম। ধূমপানের ফলে তামাক নামক পদার্থের দহনে সৃষ্ট Co আমাদের রক্তে মিশে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিনের (CoHb) মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সিগারেট খান না এমন ব্যক্তির রক্তে Co-র পরিমাণ ২-৪%, অপরদিকে অনবরত ধূমপান করেন এমন ব্যক্তির রক্তে এর পরিমাণ ৮-১২ শতাংশ। KES হাসপাতালের ফুসফুস বিভাগের অধ্যাপক ও ইণ্ডিয়ান চেস্ট সোসাইটির ডাঃ কামেথ-এর মতে একটি সিগারেটে স্থিত আলকাতরার পরিমাণ ২৭-২৮ মিলিগ্রাম। যার প্রায় ১৩-১৪ মিলিগ্রামই ধোঁয়ার সঙ্গে বেরেয়ে আসে। তিনি বলেন, শুধু এটাই নয়, ধোঁয়াস্থিত বেনজপাইরিনও ক্যানসারের সম্ভাবনাকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। তিনি এও বলেন, বিড়ি ও সিগারেট সমান ক্ষতিকর। ফিল্টার সিগারেটকে কম ক্ষতিকারক বলে মনে করারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাঁর মতে দুক্ষেত্রেই ক্ষতির মাত্রা সমান। এমনকি, ভেণ্টিলেটেড সিগারেটের নতুন আবিষ্কৃত ফিল্টারের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা।

আমাদের সাধারণ চিন্তায় মনে হয়, ধূমপানে বোধ হয় শুধুমাত্র নিজের (ধূমপায়ী) ছাড়া অন্য কারও ক্ষতি করা হয় না। কিন্তু সেটি একেবারেই ভুল ধারণা। টোকিও রিসার্চ সেণ্টারের টি হিয়াসবয়ার নামে এক গবেষক জাপানে ১৪২০০০ মহিলা এবং ১২২০০০ পুরুষের উপর ১৪ বছর ধরে (১৯৬৫-৭৯) এক সমীক্ষা চালান ; সেই সমীক্ষার ফল থেকে জানা গেছে, যে সব মহিলার স্বামী বা অন্যান্য নিকট আত্মীয় ধূমপান করেন, তাঁরাও ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হন। বিপরীত ক্ষেত্রে যে সব মহিলার স্বামী বা নিকট আত্মীয় ধূমপায়ী নন, তাঁদের ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যানসারের আনুপাতিক হার প্রায় অর্ধেক। লক্ষণীয় যে, প্রত্যেকের বয়স ৪০-এর কাছাকাছি। এও দেখা গেছে, প্রতি ১১ জন ধূমপায়ী ব্যক্তি ফুসফুসের ক্যানসারে মারা গেলে তার সন্নিকটস্থ ধূমপানে বিরত ব্যক্তির দু'জন (অর্থাৎ ১১ : ২ অনুপাতে হারে) মারা যান সেই একই কারণে। আবার এও জানা গেছে, ধূমপায়ী পিতামাতার সন্তানেরা জন্মের প্রথম বছর অন্য সন্তানদের তুলনায় শ্বাসযন্ত্রের রোগে বেশি ভোগে। পুরুষেরা দিনে এক প্যাকেটের বেশি সিগারেট খেলে তাদের পত্নী বা প্রণয়ী যেই হোন না কেন, রীতিমত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ঘটনাটি প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের খুবই চোখে পড়ে। কিন্তু তারা হয়ত জানেন না যে, মনের অগোচরে কত বেশি সিগারেট তারা এমনিই খেয়ে ফেলেন (বিশেষ করে যারা কাঠের উনুনে রান্না করেন) শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, কাঠের উনুনে রান্না করতে একজন মহিলার শরীরে যে পরিমাণ বেন্‌জ্‌পাইরিন যায় সেটা প্রায় ২০ প্যাকেট সিগারেট খাওয়ারই সামিল। এই ব্যাপ* ও মোট নিলম্বিত কণা বা T S P (Total Suspended Particles) ধোঁয়ার সঙ্গে যে পরিমাণ নির্গত হয় তা শরীরে গেলে রন্ধনরতা মহিলার ক্যানসারের সম্ভাবনা খুবই বেড়ে যায়।

এখন কথা হচ্ছে, ধূমপান কি করে ক্যানসার সৃষ্টি করে ? বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সিগারেটের ধোঁয়ায় উপস্থিত নানা পদার্থের মধ্যে বিশেষ করে টার, নিকোটিন ও বেন্‌জপাইরিনের ক্যানসার প্রচোরক শক্তি বেশ তীব্র। পদার্থগুলি সোজাসুজি ধোঁয়ার মাধ্যমে ফুসফুসে গিয়ে আঘাত করে। ফলে ক্যানসারের সম্ভাবনাকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়। আর প্রাণরসায়নবিদরা একটু গভীর আলোকপাত করে বলেন, সিগারেটের ধোঁয়ার নিকেল ফুসফুসে জমতে জমতে নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা ফুসফুসে বেন্‌জ্‌পাইরিন হাইড্রক্সিলেজ

* ব্যাপ (BAP) : পুরো নাম—বেনজিপাইরিন (Benzpyrine)।

উৎসেচকের আহরণ কমিয়ে দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় ফুসফুসের ক্যানসার। এও জানা গেছে, ধূমপান করলে শ্বাসনালীর দেয়ালের আবরক কলায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যায়। কোষের ধরনধারণ বদলে যায়, দেখতে পাওয়া যায় অস্বাভাবিক, অনিয়মিত, বিচিত্র কোষসমূহ। ধূমপানের অভ্যাস ছেড়ে দিলে কিন্তু কিছুকাল পরে আবরক কলা আবার সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অবশ্য যারা সিগারেট খান তাঁদের সকলেরই ক্যানসার হয় না। আসলে সিগারেট খেলে ক্যানসারের প্রবণতা বাড়ে। একথা সত্যি যে ধূমপায়ীদের একটা বড় অংশই এরোগের শিকার হন। রোগটি আরম্ভ হওয়ার আগের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যেমন—(ক) কোষের ওপর সক্রিয় কোন উৎসেচকের প্রভাব (খ) বিপাকীয় ব্যবস্থায় পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যানসার সৃষ্টিকারক বস্তুর উদ্ভব, (গ) বংশগত কারণ ইত্যাদি।

৩. ভাইরাসের ভূমিকা :

ক্যানসার কি ভাইরাস ঘটিত রোগ? বহু বিতর্কিত প্রশ্ন এটি, যার সদুত্তর সন্ধান বহুকাল ধরে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। এতাবৎ যে কিছুই জানা যায় নি তাও নয়। তবে, যা জানা গেছে তা নিতান্তই গোলমেলে, বিপক্ষেও যুক্তি মিলেছে অনেক। তাই জোরগলায় কিছুই বলা যায় না।

১৯১১ সালে পেটন রোয়াস (Peyton Rous) প্রথম মুর্গির সারকোমা তৈরীতে ভাইরাসকে দায়ী করেন। যথারীতি তিনি মুর্গির দেহে ভাইরাস ঢুকিয়ে সারকোমা তৈরী করে দেখালেন। অবশ্য দ্বিমত জানিয়েছেন অনেকেই। এবার ১৯৩২ সালের একটি ঘটনা। এ সময় বিজ্ঞানী শোপ (shope) খরগোসের চামড়ায় এক জাতীয় ভাইরাস ঢুকিয়ে দেখলেন, তার হল একটি পীড়কাকৃতি টিউমার বা প্যাপিলোমা (Papilloma)। এদিকে ১৯৩৬ সালে বিজ্ঞানী বিটনার (Bittner) যা শোনালেন তাতে বোধহয় অনেকেই একটু আশ্চর্য হবেন। তিনি বললেন, যে ইঁদুরের স্তনে ক্যানসার হয়েছে তার স্তনের দুধজাত একটি পদার্থ নবজাতকের দেহে ইনজেকশন করলে তারও ক্যানসার হতে পারে। ভাইরাসের উপস্থিতি প্রমাণ করতে গ্রস (Gross) ১৯৫১ সালে একটি পরীক্ষা করলেন। এতে তিনি লিউকিমিয়ায় ভুগছে

এমন নেংটি ইঁদুরের লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত কলার কোষমুক্ত নির্যাস (cell free extract) অন্য একটি সুস্থ ইঁদুরের দেহে ঢুকিয়ে দিলেন। সেটিরও লিউকিমিয়া হল। সারা স্টুয়ার্টও (Sarah Stewart) একইভাবে ইঁদুরে সৃষ্টি করতে পারলেন প্যারটিড গ্রন্থির ক্যানসার।

গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে নতুন কলা সৃষ্টি করে (tissue culture) তাতে পলিওমা (Py) ভাইরাস বা স্টিওয়ার্ড (SE) ভাইরাস ঢুকিয়ে বিভিন্ন টিউমার সৃষ্টির ঘটনা বিরল নয়। ভাবতে অবাক লাগলেও ল্যাবরেটারিতে কৃত্রিমভাবে কোষ তৈরীর (cell culture) ঘটনা বহুদিন থেকেই আমাদের জানা।

বিজ্ঞানীরা এতাবৎ দু'ধরনের ক্যানসার ভাইরাসের কথা বলেছেন—DNA যুক্ত (পলিওমা ভাইরাস) ও RNA-যুক্ত (রোয়াস চিকেন সারকোমা ভাইরাস)। ভাইরাসের আক্রমণ সংক্রান্ত ব্যাপারটা মানুষের ক্ষেত্রে যেরকম পশুপাখীর ক্ষেত্রে ঠিক অন্য রকম। যেমন, বিটানাফিলামিন (betanaphylamine) মানুষ ও কুকুরের মূত্রাশয়ের ক্যানসারের কারণ হলেও ইঁদুরের নয়। আবার, বেঞ্জিডিন (benzedine) মানুষের মূত্রাশয়ে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখলেও কুকুরে পারে না। একইভাবে, অ্যাডেনো ভাইরাস—১৮ স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের নাকে অবস্থান করে, কোন ক্ষতি করে না ; কিন্তু এই ভাইরাসই ইঁদুরের ক্যানসারের অন্যতম কারণ বানরের SV_{40} ভাইরাসের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাটা একই রকম।

এবার এক বিচিত্র ভাইরাসের কথা বলা যাক। বিচিত্র বললাম এই কারণেই যে এরা বহুদিন পোষকের দেহে চুপচাপ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, আবার সময়মত ঠিক জেগে ওঠে। যেমন হারপিস (herpes simplex) ভাইরাস, লিম্ফোসাইটিক কোরিও মেনিনজাইটিস ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমে ইঁদুর ভ্রূণাবস্থায় সংক্রমিত হয়। এবার তার কাজ মাথায় চুপটি করে বসে থাকা ; তারপর ইঁদুরটি জন্মের পর আস্তে আস্তে বড় হলে আশ্রয়দাতা ও পরজীবীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে (host-parasite relationship) কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটলেই ইঁদুরটি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। আবার, বিজ্ঞানী বিটনারের মতে, স্তনে ক্যানসার হয়েছে এমন নেংটি ইঁদুরের দুধ পান করে যে ছানা (বাচ্চা নেংটি ইঁদুর) বড় হয় সেটিও ক্যানসার ভাইরাসে সংক্রমিত হয়। এখানেও সেই ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে টিউমার হয় না, বা

হলেও সে অনেক পরে যখন সেটা বড় হয়ে ওঠে। জানা গেছে, ইঁদুরের স্তনে ক্যানসার হবার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে—(ক) বংশগত (খ) ডিম্বকোষের হরমোন যদি যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং (গ) ভাইরাসের উপস্থিতি।

মনে রাখা দরকার, মানুষের স্তনের ক্যানসার ভাইরাস আক্রমণের ফলশ্রুতি বলে আজও প্রমাণিত হয়নি। গবেষণাগারে স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে একটি মাত্র টিউমারই মানুষের ক্ষেত্রে ভাইরাস ঘটিত। সেটি হল আঁচিল (wort)। তবে জন্তুজানোয়ারের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত নয়। কৃত্রিম কলা তৈরী করেও তাতে আঁচিল সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। মানুষের টিউমারে ভাইরাস পাওয়া যায় নি। ভালকথা। কিন্তু তা বলেতো আর জোর গলায় বলা বলা যায় না যে টিউমারটি ভাইরাস ঘটিত নয়। কেউ কেউ নাকি লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর শ্বেতকণিকাতে ভাইরাসের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। আর ভাইরাসঘটিত হলে কিন্তু সেটি সংক্রামক হওয়ার কথা। আমাদের সৌভাগ্য, টিউমার-ভাইরাস সংক্রামক বলে প্রমাণিত হয়নি। পরোক্ষ প্রমাণে দেখা গেছে, প্রাণীদেহে ক্যানসার সৃষ্টিকারী RNA-ভাইরাস আছে, তেমনি আছে মানুষের লিউকিমিয়া-কোষেও। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা এখনো সরাসরি এক বাক্যে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারছেন না যে মানুষের সব ক্যানসার ভাইরাস ঘটিত কিনা। কি অদ্ভুত ব্যাপার, বেড়ালের লিউকিমিয়া সৃষ্টিকারী ফেলাইন লিউকিমিয়া ভাইরাস (Felv) দ্বারা গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত মানুষের কোষেও লিউকিমিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

সম্প্রতি বারকিট লিম্ফোয়েড কলাতে (Burkitt lymphoid tissue) ভাইরাসের অবস্থান সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য সিদ্ধান্তে আসা গেছে। পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত বহু প্রমাণ এপস্টেইন-বার (Epstein-Berr (E B)) ভাইরাসের সঙ্গে ক্যানসার সৃষ্টির একটি নিকট সম্পর্ক সূচিত করে। এক্ষেত্রে সৃষ্ট ক্যানসারকে নাক ও ফ্যারিংকস্-এর রোগ বলেই জানি। EB-ভাইরাসের পিছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। দুবছর ধরে গবেষণার পর অধ্যাপক এপস্টেইন (Epstein) এবং তাঁর সহকর্মী বার (Barr) লণ্ডনের মিডলেক্স হসপিটালে বারকিট লিম্ফোমা কলায় মানুষের নতুন হারপিস ভাইরাসের খোঁজ পেলেন। সেটাই পরে এপস্টেইন-বার (EB) ভাইরাস নামে পরিচিত লাভ করল। এই ভাইরাসগুলিকে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখবিবরস্থ রসে (mouth fluid) পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। এই রস দ্বারাই-EB ভাইরাস আক্রমণ ছড়ায়।

আফ্রিকান ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে শৈশবে। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এই আক্রমণ ঘটে বয়ঃসন্ধিকাল অবধি। এই সব দেশে ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার হাতিয়ার হিসাবে ভ্যাক্সিন প্রস্তুতির উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

৪. সূর্যালোক ও ক্যানসার ঃ

আমরা জানি, একটি সীমাবদ্ধ মাত্রার মধ্যে সূর্যালোক উপকারী। সূর্যালোক চর্মস্থিত ব্যাক্টীরিয়া ও ছত্রাককে মেরে ফেলে। মুক্ত সূর্যালোক হাঁপানি, সন্ধির দীর্ঘস্থায়ী বেদনা (aching joint) থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। কমমাত্রার সূর্যরশ্মি শরীরে ভিটামিন D_3 বা ক্যালসিফেরল সংশ্লেষে সাহায্য করে। ভিটামিনটি হাড়ের ক্যালসিয়াম শোষণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এর অভাবজাত রোগ রিকেট-এর কথা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। রোগটি পঙ্গুত্ব সৃষ্টিকারী নামেও পরিচিত। হাড়ে ক্যালসিয়ামের অভাবে রোগটির উৎপত্তি।

বিভিন্ন উপকারী গুণের সঙ্গে সূর্যালোকের অপকারী ত্রুটির সংখ্যা মোটেই কম নয়। সূর্যালোকের অতি বেগুনী রশ্মি (UV-Ray) পৃথিবীর ২০ কিলোমিটার দূরবর্তী ওজোন স্তরে শোষিত হয়। ওজোন স্তরে কোন শূন্যস্থান সৃষ্টি হলে সে স্থান দিয়ে অতি বেগুনি রশ্মির বিকিরণ মানুষের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এর ফল চোখের দৃষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে রৌদ্রদাহ (দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে এ রোগে চামড়া পীতাভবর্ণ ধারণ করে), বৃদ্ধি হ্রাস, পরিব্যাপ্তি বা মিউটেশন, এমনকি চামড়ার ক্যানসার অবধি গড়াতে পারে। সাধারণভাবে তিন ধরনের চামড়ার ক্যানসার আছে। এক, বুনিয়াদি কোষ গঠিত কার্সিনোমা। এটি খুব বেশি মারাত্মক নয়। প্রথম অবস্থার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করা যায়। এটি মুখমণ্ডলেই বেশি হয়। ফলে মুখের গঠনের কিছু পরিবর্তন আসতেই পারে। দুই, শল্করূপী কোষ গঠিত কার্সিনোমা। এটিও খুব একটা আতঙ্কের নয়। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করলে এর থেকেও মুক্তি পাওয়া কঠিন নয়। উপরোক্ত দুই ধরনের ক্যানসারেরই আক্রমণ ঘটে বহিস্তকে। আর কৃষ্ণাবুর্দ বা মেলানোমা হল তৃতীয় ধরনের ক্যানসার, এর আক্রমণ আগের দুটির চেয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে কম। কিন্তু মৃত্যুর সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশি। চামড়ার ক্যানসারের সূত্রপাত ঘটে কৃষ্ণকণিকা বা মেলানোসাইট রূপে। পরে ধীরে ধীরে সহজেই দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে

পড়ে। কোন নির্দিষ্ট স্থানের গুটি বা আঁচিলের উপর অতি বেগুনী রশ্মির ক্রিয়াই মেলানোমার সম্ভাব্য কারণ। পিতৃপুরুষের জিনের প্রভাবেও এটি অপত্য বংশে বর্তাতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। প্রথম অবস্থায় চামড়ার ক্যানসার দেখতে ঠিক ক্ষতের মতো। এই ঘা সহজে সারতে চায় না। ক্ষতের আকৃতির পরিবর্তনও চোখে পড়ে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ই এ-রোগ নিরাময়ের শ্রেষ্ঠ পথ। সূর্যালোকের অতি বেগনী রশ্মির ১০০০°-৩৮০০°A কম্পাঙ্কের আলোই রোগসৃষ্টিকারী মূল আসামী। সূর্যালোকের একটি ক্ষুদ্র অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সৌরশক্তি ক্রমহ্রাসমান শক্তি অনুসারে কসমিক, গামা, এক্স্, ইউ. ভি, দৃশ্যমান, অবলোহিত বা ইনফ্রারেড, রাডার ও রেডিও বিকিরণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের রশ্মিতে বিভক্ত। ৩০০০°A-এর কম মাত্রার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত রশ্মি ওজোনের স্তরে বাধা পায়। আবার ১৯০০°A-এর কম মাত্রার অতিবেগুনী রশ্মি বাতাস ও কুয়াশাতে শোষিত হতে পারে। জানা গেছে, একটি পরিষ্কার দিনে ৩০০০°A তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মির পক্ষে পৃথিবীর তলে পৌঁছানো অস্বাভাবিক কিছুই নয়। এও জানা গেছে, সেই রশ্মির জীবাণুনাশক ক্ষমতাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

রঙ্গকায়িত ত্বকশুষ্কতা বা জেরোডারমা পিগমেনটোসাম (Xeroderma Pigmentosum) রোগটি আমাদের বেশির ভাগের কাছেই নতুন। বাস্তবে রোগটি বেশ বিরল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি একটি বংশগত রোগ। তাঁরা বলেন, সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে এ রোগের সম্ভাবনা খুব বেশি।

মেলানিন একটি চর্মস্থিত রঙ্গক। এটি শরীরে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে অতি বেগুনী রশ্মির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অতি বেগুনী রশ্মি দেহত্বক ভেদ করলেই মেলানোসাইট তৎপর হয়ে ওঠে। দেহত্বকের গভীরে স্থিত এই মেলানোসাইটের দ্বারা তখনই শুরু হয় রঙ্গকটির সংশ্লেষ। অবশেষে মেলানিন সংশ্লেষিত হয়। তাই পরিমিত মেলানিনের অভাবে চামড়ায় অতি বেগুনী রশ্মির কুপ্রভাব বাড়ে। রশ্মিটি ত্বকের কোষগুলিকে ধ্বংস করে বিষাক্ত করে তোলে। ঠিক একই সময়ে ত্বকের জালিকাগুলোও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আগেই বলা হয়েছে, সূর্যালোকের প্রভাবে আমাদের ত্বকের ক্যানসার হতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে সুস্থ, স্বাভাবিক কোষগুলির DNA নষ্ট হলে তবেই সেগুলি ক্যানসার কোষে পরিবর্তিত হয়।

পরবর্তী ক্ষেত্রে DNA-গুলির সংশোধন হলে বা ত্রুটি সংশোধন হলে তার ফল হিসেবে কোষগুলি টিউমারের রূপ নেয়।

5. ক্যানসার সৃষ্টিতে খাদ্যের ভূমিকা :

খাদ্যের সঙ্গে ক্যানসারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু কি ধরণের খাদ্য? আমিষ না নিরামিষ? কোনটি ক্যানসারের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি সম্পর্কযুক্ত? এর উত্তর এখনো পরিষ্কার নয় যদিও অনেকের মতে আমিষখাদ্য খেলে শরীর বিভিন্ন রোগের আকর হয়, এ কথাও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নির্ভর নয়। যারা মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য খান না, তাঁরা কি ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবিটিস, থ্রম্বোসিস, কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation) ইত্যাদি রোগে ভোগেন না? রক্ষা পান কি তাঁরা ক্যানসারের কবল থেকে? পুষ্টি ও ক্যানসারের মধ্যে সরাসরি সম্পর্কের কথা এখনো জানা যায় নি। তবে পরিমাণমতো ক্যালোরি-যুক্ত সুষম খাদ্য সাধারণভাবে সব রোগেরই প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ক. আমাদের অনেকেরই ধারণা চা ও কফি পাতায় স্থিত উপক্ষার বা অ্যালকলয়েড কেফিন অগ্নাশয়ের ক্যানসারের কারণ। তবুও জানা দরকার, নির্দোষ অ্যালকলয়েড হিসেবে মাত্রাবদ্ধ কেফিনের সুখ্যাতি কম নয়, শরীরের কোন ক্ষতি করে না। আজকাল অনেক অ্যালোপ্যাথিক টনিকের মধ্যে কেফিন মেশানো হয়। চা পাতায় ৩-৪ শতাংশ এবং কফি পাতায় ১½-২ শতাংশ কেফিন থাকে। চা পাতায় থিন নামে আরও একটি উপক্ষার থাকে।

খ ফ্যাট জাতীয় খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে স্তন-ক্যানসারের একটি নিকট সম্পর্ক বিজ্ঞানীদের নজরে এসেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারাই চর্বিজাতীয় খাদ্য বেশি খান স্তনের ক্যানসারে তাঁরাই বেশি আক্রান্ত হন। বিজ্ঞানীরা এও বলেছেন স্নেহ পদার্থ প্রাণী ঘটিত হলে তার ফল আরও মারাত্মক।

স্তনের ক্যানসার : স্তনের ক্যানসার বেশি হয়ে মেয়েদের। পুরুষের মাত্র ১৫ শতাংশ ক্ষেত্রে এটা হতে পারে। যুক্তরাজ্যে বছরে ৭৫০০ মহিলা স্তনের ক্যানসারে মারা যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা ১৫,০০০। এটি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মহিলাদের মোট মৃত্যুর অন্যতম কারণ। ক্যানসারে মারা যায় এমন মহিলাদের এক-পঞ্চমাংশেরই কারণ এই স্তন-ক্যানসার। মহিলা মৃত্যুর ২৫টির মধ্যে একটির কারণ এটি। সাধারণত এ রোগে প্রথমে স্তনে বেদনাহীন গুটি বা পিণ্ড সৃষ্টি হয়। স্তনের বোঁটায় একজিমার মতো ঘাও

দেখা দিতে পারে। পিণ্ডটি বেদনাহীন হওয়ায় এ রোগ প্রায়ই ধরা পড়ে না। পড়লেও সে অনেক দেরীতে। এই অবসরে রোগটি ভালই ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, দেহে একটি বিশেষ উৎসেচকের উপস্থিতিতে স্তনের ক্যানসারের প্রাবল্য বাড়ে। উৎসেচকটির নাম গ্লুটাম্যাটেপাইরুরেট ট্রান্সঅ্যামিনেজ। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া স্কুল অব পাবলিক হেলথ এর মেরিক্লেয়ার কিং এ নিয়ে বিভিন্ন পরিবারের ওপর একটি সমীক্ষা চালান। আগেও ঠিক এই ধরনের সমীক্ষা কয়েকবার চালান হয়েছিল। এর ফলে তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, স্তনের ক্যানসার হয়েছে এমন রোগীর নিকট আত্মীয়দের মধ্যেও এর আশঙ্কা বেশ তীব্র। কিন্তু তার অন্যান্য সহযোগী ১৫০টি পরিবারের ওপর ৫ পুরুষ ধরে একটি পর্যবেক্ষণ চালান। প্রায় ১৩ শতাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ; দেহে সেই বিশেষ উৎসেচকের উপস্থিতিতে এ রোগের সম্ভাবনা বাড়ে। সমীক্ষার ভিত্তিতে তাঁদের বক্তব্য ঃ এ রোগের সঙ্গে জিনের নিবিড় যোগাযোগ সম্পর্কে তারা নিশ্চিত। সামগ্রিক বিচারে ব্যাপারটি এখনো গোলমেলে। কিছু বিজ্ঞানীদের মতে স্তনের ক্যানসার একটি বংশগত রোগ। পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোন নারীর মা কিংবা বোনের স্তন যদি ক্যানসার গ্রস্ত হয় তবে সে নারীরও স্তনে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। বিপক্ষেও মিলেছে বহুরকম যুক্তি। তাই কিছু বিজ্ঞানী এটিকে মানতে পারেন নি। চূড়ান্তভাবে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।

স্তনের ক্যানসার কি ভাইরাস ঘটিত ? এর মূল উত্তরটি আমাদের অজানা। জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে এতে নাকি রয়েছে ভাইরাসের ভূমিকা। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হয় নি। তবে এ রোগে আক্রান্ত পরিবারের সুস্থ মহিলাদের স্তনে যেমন ক্যানসার প্ররোচক ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে, তেমনি মিলেছে কোন কালেই আক্রান্ত হয়নি এমন পরিবারের মেয়েদের স্তনে। তাই ভাইরাসকে এর সুনিশ্চিত কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় নি। আবার কিছু বিজ্ঞানীর মতে স্তন ক্যানসারের মূলে রয়েছে এক ধরনের ভাইরাস বিটারনাস মিল্ক ফ্যাক্টর।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, অবিবাহিতা নারীরা এ রোগে বেশি ভোগেন। সন্ন্যাসিনী, অপুত্রক মা'র ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয় এই রোগের আধিক্য। আজকাল আধুনিকা মায়েরা সন্তানকে তার প্রাপ্তব্য সেই অমৃতসুধারূপী মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করেন। তাঁরা নজর রাখেন একটি সাধারণ সামান্য

ব্যাপার, স্তনের "শেপ" বজায় রাখার দিকে। অথচ এর ফলে তাদেরও স্তনের ক্যানসারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। যারা ১২ বছর বয়সের আগেই ঋতুমতী হন কিংবা ৫০ বছর অতিক্রান্তে যাদের রজোবন্ধ হয়, গবেষণায় প্রকাশ, তাদের ক্ষেত্রেও এই রোগের সম্ভাবনা প্রবল। চিকিৎসকরা নিশ্চিত যে, স্তনে কোন আঘাত থেকে এ রোগের আক্রমণ ঘটেনা। তাঁরা বলেন, মেয়েদের বক্ষ সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক আবরণগুলি (চলতি কথায় 'Bra') বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বেশি মোটা, ভারী ও সিন্থেটিক হওয়ায় সেগুলো স্তনের উষ্ণতা বাড়ায়। দীর্ঘকাল ধরে একইভাবে বর্ধিত এই উষ্ণতাই স্তনের ক্যানসারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের মতে, উন্নত দেশের মহিলারা উন্নয়নশীল দেশের মহিলাদের তুলনায় এ রোগে বেশি ভোগেন। ব্যতিক্রম কেবল জাপান। কিন্তু জাপানি মহিলাদেরই যাঁরা আবার আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা তাঁরা যথারীতি এ রোগে বেশি ভোগেন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, পরিবেশের প্রভাবও এতে আছে। বিতর্কিত হলেও কিছু বিজ্ঞানীর মতে গর্ভ নিরোধক পিলের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার স্তনে ক্যানসার সৃষ্টির সহায়ক। এমনকি উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ব্যবহৃত ওষুধ রিজারপিনের অত্যধিক প্রয়োগ স্তনে ক্যানসার ঘটিয়ে থাকে। এ তথ্য জানা গেছে ইংল্যন্ড, ফিনল্যান্ড ও আমেরিকার বোস্টন অঞ্চলে চালানো পরীক্ষার ফল থেকে।

এ ছাড়া ফ্যাটজাতীয় পদার্থ কোলেস্টেরলকেও কার্সিনোজেনের আওতায় ফেলা হয়। যদিও কোষের মারক বৃদ্ধিতে (malignant growth) এর ভূমিকা কতখানি তা এখনো অস্পষ্ট।

গ. **ক্যানসার ও রঞ্জক** : কতগুলি রং-এর ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। নাম অ্যাজো যৌগ। যেমন, টকটকে লাল বা স্কারলেট, মাখনের মত হলদে রং (butter yellow) প্যারাডাইমিথাইল অ্যামিনো অ্যাজোবেঞ্জিন ইত্যাদি। যকৃতে রিবোফ্ল্যাভিন বা ভিটামিন B_2-এর অভাবে শেষের পদার্থটি যকৃতের ক্যানসার সৃষ্টি করে কথাটি শুনলে সত্যি গা শিউরে ওঠে। আমরা বাজারে ছোট ছোট ভাইবোনেদের প্রিয় রং-মেশানো আইসক্রিম, লজেন্স, টফি ইত্যাদি অহরহই বিক্রি হতে দেখি। মিষ্টির দোকানে বিক্রিত আমাদের প্রিয় রং-বে-রং-এর মিষ্টিগুলোও কত না আকর্ষণীয়। অথচ এগুলোতেই হয়ত আছে ক্যানসার সৃষ্টিকারী বিভিন্ন কৃত্রিম বা সিন্থেটিক রং। এছাড়া আমাদের দেশে ময়দা, সুজি, বেসন থেকে প্রস্তুত মিষ্টান্ন দ্রব্য যেমন জিলিপি, মিহিদানা, দরবেশ, লাড্ডু প্রভৃতির ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ রং-এর মিশ্রণ আছে। বিশেষ

করে মেটালিন ইয়োলোর অত্যধিক প্রয়োগে এসব খাদ্যবস্তুকে হলদে রং করা হয়। এই রংটি দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া ঘটায়। আর লজেন্স, টফি, চক্‌লেট, চা, কফি, অচার প্রভৃতির প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে সস্তা ও বিষাক্ত রং-এর ব্যবহার এদেশে প্রায় সর্বত্র। জানলে হয়ত অনেকে অবাকই হবেন, বিভিন্ন পানীয়, লজেন্স, টফি ইত্যাদিতে উল, পশম, সিল্ক ইত্যাদি রং করার জন্যে ব্যবহৃত সস্তা হানিকর রং মেশানো হয়। যেমন অরাসিন, যা বেশি মাত্রায় শরীরে গেলে ক্যানসারও হতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যে কোন কৃত্রিম রং-এরই অল্প হলেও বিষক্রিয়া আছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এক এক বিজ্ঞানীর মতে কেবলমাত্র তিনটির একটি অমারান্থ রেড। এটি খুবই জনপ্রিয় লাল রং। খাদ্যদ্রব্য ওষুধপত্র, প্রসাধনী দ্রব্য ইত্যাদি অনেক জিনিসেই এর ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু মস্কোর ইনস্টিটিউট ফর নিউট্রিশন-এর গবেষণায় জানা গেছে, অমারান্থ ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে, প্রাণীদের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে। শুধু কি তাই, এর অত্যধিক ব্যাবহারে মাতৃগর্ভে ভ্রূণেরও নাকি বিকৃতি ঘটতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকেও উপরোক্ত তথ্যের সমর্থন মেলে। আসল কথা, কৃত্রিম রং অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ যাই হোকনা কেন, বেশি পরিমাণে শরীরে গেলে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অন্য এক রকমের সংশ্লেষিত রং সাইট্রাস রেড নং ২ ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই কোন খাবারে এই রং মেশানো নিষিদ্ধ।

ঘ. স্যাকারিন ঃ স্যাকারিনের কথা নতুন করে খুব একটা আলোচনা করার আর কিছু বাকী নেই। কারণ ক্যানসার সৃষ্টিকারী সন্দেহজনক আসামী হিসেবে বহুদিন থেকেই আমরা একে জানি। স্যাকারিনের ক্যানসার সৃষ্টিকারী ভূমিকা সম্পর্কে বিজ্ঞান শিবিরে মতবিরোধ এখন তুঙ্গে। গত কয়েকবছর ধরে বিভিন্ন জন্তুজানোয়ার, এমন কি মানুষের ওপর ক্যানসার সম্বন্ধীয় গবেষণায় কৃত্রিম মিষ্টিদ্রব্য স্যাকারিন ও সাইক্ল্যাম্যাটকে মূত্রথলীর ক্যানসারের জন্যে দায়ী হিসেবে সন্দেহ করা হয়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, কৃত্রিম মিষ্টিদ্রব্য ব্যবহার করেন না এমন লোকের চেয়ে ব্যবহার করেন এমন লোকের ক্ষেত্রে ক্যানসারের ঘটনা অনেক বেশি। ইউ. এস. ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট-এর ক্যানসার সম্বন্ধীয় গবেষণা তাঁদের প্রকাশিত ধারণাকে আরো জোরদার করেছে। ৩০০০ জন মূত্রাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগী এবং ৬০০০ জন সুস্থ, স্বাভাবিক প্রাপ্ত

বয়স্ক লোকের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা একটি সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যে এসেছেন এবং সিদ্ধান্তটি তাঁদের ধারণাকে নির্ভুল বলেও প্রমাণিত করেছে। দেখা গেছে, মূত্রথলীর ক্যানসারের প্রাবল্য মেয়েদের থেকে পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি। প্রতি চারজন মূত্রথলীর ক্যানসার রোগীর তিন জনেই পুরুষ। বাকী একজন স্ত্রীলোক। উপরোক্ত সমীক্ষায় তাঁরা ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রেই মূত্রাশয়ের ক্যানসার বৃদ্ধির একটি প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য সমীক্ষা চালানোকালে তাঁরা কিছু বেশি মাত্রায় কৃত্রিম মিষ্টি দ্রব্য তাদের খাইয়েছিলেন। সমীক্ষায় এও দেখা গেছে যে মেয়েদের মধ্যে যারা কৃত্রিম মিষ্টি দ্রব্য গ্রহণে সাধারণের ওপরে, মূত্রথলীর ক্যানসারের সম্ভাবনা তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ৬০ শতাংশ বেশি। ওপরের সমীক্ষায় স্যাকারিন ও সাইক্ল্যামেটের কোনটি মূত্রাথলীর ক্যানসার সৃষ্টিতে আপক্ষাকৃত বেশী অগ্রণী তা বোঝা যায় নি। তবে হ্যাঁ, একটি কথা না বললেই নয় যে ১৯৭০ সালে আমেরিকার 'ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' সাইক্ল্যামেট ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তবেই স্যাকারিন আমাদের এত প্রিয় হতে পেরেছে। আর তখন থেকেই বোঝা গেল, স্যাকারিন অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর। প্রসঙ্গত স্যাকারিন একটি কৃত্রিম মিষ্টি দ্রব্য। এর কোন পুষ্টিমূল্য বা খাদ্যগুণ নেই। ইক্ষুশর্করা থেকে এর মিষ্টত্ব প্রায় ৬০০ গুণেরও বেশি। রসায়নের ভাষায় এর নাম—অর্থোসালফো বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড ইমাইড। স্যাকারিন জলে অদ্রবণীয়। বাজারে সোডিয়াম লবণের ডাইহাইড্রেট রূপে বিক্রি হতে দেখা যায়। অনেকের মতে স্যাকারিন একটি কম আণবিক গুরুত্বের যৌগ। ফলে সহজেই মূত্রথলীতে শোষিত হতে পারে। সম্ভবত তারই ফলে দেখা দেয় মূত্রথলীর ক্যানসার। অপরদিকে আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট-এর একটি সমীক্ষার ফল থেকে জানা গেছে' পরিমিত মাত্রায় স্যাকারিন ব্যবহার কারীদের আপাতভাবে ক্যানসারে কোন ভীতি থাকার কারণ নেই। প্রায় তিন বছর বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েও মূত্রথলির ক্যানসারের কোন নজির আমাদের সামনে তাঁরা হাজির করতে পারেন নি।

জানা গেছে, অল্প পরিমাণ স্যাকারিন মোটেই বিপদজনক নয়—উল্টোটিতেই বিপদ। অর্থাৎ এর ব্যবহার সাধারণ ব্যবহার মাত্রার ৩—৬ গুণ ওপরে উঠলেই বিপদ হানা দিতে পারে। যেমন ধরা যাক, আমরা যদি চিনির খরচ বাঁচাতে শুধুমাত্র স্যাকারিনের ওপর অনেকটা ইচ্ছে করেই নির্ভরশীল হই

তবে তার ফল কিন্তু আশংকা জনক হতে পারে। অবশ্য চূড়ান্তভাবে কিছু বলা এখনই সম্ভব হচ্ছে না। তবে ইঁদুর, গিনিপিগ প্রভৃতি জন্তুকে খাদ্যে ৭·৫ শতাংশ স্যাকারিন মিশিয়ে ২৪ মাস খাওয়ানোর পরও দেখা গেছে মূত্রথলিতে ক্যানসার হয়নি। প্রতিদিন প্রতি কেজি শারীরিক ওজনে ৫০০ মিলিগ্রাম হিসেবে ৬—৭ বছর ধরে বানরকে স্যাকারিন খাইয়েও শরীরে কোন অবনতি লক্ষ্য করা যায় নি। মানুষের ওপর যে পরীক্ষা চালানো হয়নি তাও নয়। এক্ষেত্রে ১২টি গবেষণার ১১ টিরই ফল ভালো। বাকী একটিতে অবশ্য মূত্রথলীর ক্যানসারের সম্ভাবনা বেড়েছে। কিছুদিন আগেই ইংলণ্ডের বেশ কিছু রোগী মূত্রথলির ক্যানসারে মারা গেলেন। তাঁদের একজন ছিলেন ডায়াবিটিসের রোগী। যারা ডায়াবিটিস রোগী বা তা নয় তাদের মধ্যেও মূত্রথলির ক্যানসারের প্রবণতার কোন তফাৎ লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ ডায়াবিটিস রোগীরা অপেক্ষাকৃত বেশি স্যাকারিন খেয়েছিলেন। যারা অত্যধিক ধূমপান করতেন তাদের ক্ষেত্রেও মূত্রথলির ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়েনি, প্রসঙ্গক্রমে না বললেই নয় যে ধূমপানও কৃত্রিম মিষ্টিদ্রব্য গ্রহণকারীদের মূত্রাশয়ের ক্যানসার সৃষ্টির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত। প্রত্যহ পরিমিত মাত্রার কৃত্রিম মিষ্টি দ্রব্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এমন ব্যক্তি ধূমপান করলে তার মূত্রাশয়ের ক্যানসারের প্রবণতা অনেক বাড়ে। বিচার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এক্ষেত্রে ধূমপায়ীর দেহে স্যাকারিন ক্যানসারের প্ররোচক হিসেবে কাজ করে। এই পথে ক্যানসারের সৃষ্টিতে স্যাকারিনের ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন একটি পথে হতে পারে। যারা দিনে দুই প্যাকেট বা তার বেশি সিগারেট খান তাদের ক্ষেত্রেই এটি বেশি প্রকট। মেয়েদের ক্ষেত্রে ধূমপানের মাত্রা এক প্যাকেটের বেশি হলেই চিন্তার কারণ আছে। মনে রাখা দরকার, এখানে প্রতি প্যাকেটে ২০টি সিগারেট আছে এমনটিই ভাবা হয়েছে। খাদ্যে ৫ শতাংশ স্যাকারিন প্রতি কেজি শারীরিক ওজনে দৈনিক ২৫০০ মিলিগ্রাম হিসেবে স্যাকারিন খাওয়ার সামিল। এমন কি এই পরিমাণ স্যাকারিন ৮০০ বোতল লঘু পানীয়তেও থাকতে পারে। মোট কথায় স্যাকারিন মূত্রথলির ক্যানসার সৃষ্টিতে কতটা দায়ী তা এখনো গবেষণার বিষয়। এছাড়া আমেরিকান ডায়াবিটিস অ্যাসোসিয়েশন-এর মতে যতদিন আমরা স্যাকারিনের অপকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু না বলতে পারছি ততদিন ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সংবাদটি ডায়াবিটিস রোগীদের কাছে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মূল্যবান।

৬. **ক্যানসার ও ভিটামিন ঃ** খাদ্যে কয়েকটি ভিটামিন থাকা না-থাকার সঙ্গেও ক্যানসার হওয়ার ব্যাপারটি যুক্ত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফুসফুস ও অন্ত্রের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের দেহে ভিটামিন A-র পরিমাণ কম। শরীর বিজ্ঞানীদের মতে, যাদের দেহে ভিটামিন A-র পরিমাণ বেশি ফুসফুস ও অন্ত্রের ক্যানসার তুলনামূলকভাবে তাদেরই কম। এছাড়া দেহের বিভিন্ন স্থানের আবরণী কলার সুষ্ঠু গঠন নিয়ন্ত্রণে ভিটামিন A-র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ভিটামিন A-র এই গুণই ক্যানসার প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। মানব দেহের প্রতি কেজি ওজনের জন্যে প্রত্যহ ভিটামিন A দরকার ৫—৭ মিলিগ্রাম। (৪০০০-৫০০০ ইণ্টারন্যাশানল ইউনিট) দুধ, ডিম, মাখন মেটুলি কড বা শার্ক লিভার ওয়েল, গাজর, পাকা আম, পাকা পেঁপে, টমেটো, মিষ্টি আলু, পালং ও অন্যান্য গাঢ় সবুজ শাকসব্জি ইত্যাদি সাধারণভাবে ভিটামিন A-র উৎস। এক কথায় সমস্ত রঙ্গিন ফল বা সব্জি মাত্রেই ভিটামিনযুক্ত। এগুলোতে যে বিটা ক্যারোটিন থাকে তা থেকে আমাদের দেহে বিশেষ করে লিভারে ভিটামিন A তৈরী হয়।

এবার বলি ভিটামিন C-র কথা। ভিটামিন A-র মতো এই ভিটামিনও ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দেহে এই ভিটামিনের পরিমাণ কমে আসার লক্ষণ মোটেই শুভ নয়। এই অবস্থায় দেহে উপস্থিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থের কুপ্রভাব বৃদ্ধি পায়। তখন দেহের বিভিন্ন স্থানের যোগকলা বিনষ্ট হতে থাকে। ক্যানসার প্রবণতা বাড়তে থাকে অবাধে। মূত্রাশয়ের ক্যানসার রুখতে ভিটামিন C-র গুরুত্ব অবিসংবাদী। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বেশি মাত্রায় (দিনে প্রায় ১'৫ গ্রাম) ভিটামিন C গ্রহণে মূত্রথলীর ক্যানসার থেকে আরোগ্যের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। কিন্তু বেশি মাত্রায় ভিটামিন C খাওয়ার উপোযোগিতা এখানে কোথায় ? বিজ্ঞানীদের মতে গৃহীত ভিটামিনের অতিরিক্ত অংশ মূত্রের মাধ্যমে নির্গত হয়ে যায়। আর নির্গমন পথে বিভিন্ন ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থের তীব্রতা এই ভিটামিনের প্রভাবে নষ্ট হয়। নোবেল বিজয়ী মার্কিন বিজ্ঞানী লিনাস পাউলিং-এর মতে খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিত ভিটামিন C গ্রহণ করলে ক্যানসার রোগের বৃদ্ধি যেমন হ্রাস পায়, তেমনই কমে যায় সে-রোগ থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা। এই ভিটামিন টাটকা

শাক-সব্জি ও ফলে বিশেষ করে লেবু ও আমলকীতে প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে। এছাড়া পাওয়া যায় মটরশুঁটি, পালং শাক, পেয়ারা, আপেল, আঙ্গুর, আনারস প্রভৃতিতে। স্তন্যদুগ্ধেও কিছু পরিমাণ ভিটামিন C থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রান্নার সময় এই ভিটামিন কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীদের মতে ভিটামিন E ক্যানসার প্রতিরোধে কিছু ভূমিকা নিয়ে থাকে।

চ খাদ্যে আঁশজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক ঃ

সম্প্রতি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ সম্পর্কিত অনুশীলনে এবং সুদূরপ্রসারী শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ নির্ভর জ্ঞানের ভিত্তিতে অন্ত্রে আঁশ জাতীয় পদার্থের (roughage) অনুপস্থিতি ও ঘাটতি সম্পর্কিত কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। রাফেজ শব্দটি আমাদের বেশির-ভাগেরই এখন আর খুব একটা অপরিচিত নয়। বিভিন্ন প্রকার শাক সব্জি, ফলমূল, ডাঁটা ইত্যাদির আঁশ জাতীয় পদার্থটিই রাফেজ। এটি সেলুলোজ, আধা-সেলুলোজ, পেকটিন, লিগনিন প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থে তৈরী। রাফেজ পরিপাককারী কোন উৎসেচক আমাদের দেহে নেই। ফলে হজমও হয় না। তাহলেও এগুলো মোটেই ফেলনা নয়। দেখা গেছে, খাদ্যে রাফেজের অভাবে বিভিন্ন আন্ত্রিক রোগের উদ্ভব হয়ে থাকে। যেমন—মলনালী ও কোলনের ক্যানসার। শুধু মলনালী বা কোলনের ক্যানসারেই বা কেন, অসংক্রামক ও বংশগত নয় এমন অনেক রোগও এর ফলে দেখা দিতে পারে দৃষ্টান্ত হিসেবে হৃৎপেশীতে রক্তাভাবজনিত ব্যাধি বা ইস্কিমিয়া, অর্শ, হাইরেটাস হার্নিয়া, স্ফীত ও কুঞ্চিত শিরা, পিত্তপাথুরি বা গলস্টোন প্রভৃতি রোগগুলির কথা বলা যেতে পারে। বলতে গেলে রোগগুলি এখন পাশ্চাত্য দেশগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রায় ঢুকে পড়েছে। প্রাত্যহিক খাদ্যে রাফেজের অভাব কোষ্ঠ কাঠিন্য সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিতে এইসব রোগের প্রকোপ অনেক কম। শরীর বিজ্ঞানীরা এর কারণ হিসেবে পরিশুদ্ধ খাবার বা রিফাইণ্ড ফুড ও কৃত্রিম খাবার বা সিন্থেটিক ফুড-কেই দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের খাদ্যে রাফেজ থাকে না বললেই চলে। প্রতিদিনের খাবারে পরিমাণ মতো রাফেজের উপস্থিতি কয়েক ধরনের আন্ত্রিক ক্যানসার প্রতিরোধ করে। কারণ হিসেবে তারা বলেন, খাদ্য পৌষ্টিক নালীতে অবস্থানকালে বিভিন্ন

পদ্ধতিতে সেগুলি থেকে কয়েকটি ক্যানসার সৃজক পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে। পদ্ধতিগুলির মধ্যে বীজাণু ঘটিত ক্রিয়াকলাপ ও অন্যান্য কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। রাফেজপূর্ণ খাবারের দু-একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেগুলো পাকস্থলী বা অন্ত্র থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চায়। সঙ্গে বেরিয়ে যায় বৃহদন্ত্রে সঞ্চিত মল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোন কার্সিনোজেন উৎপন্ন হলেও ক্যানসার সৃষ্টি করার সময় তারা পায় না। এছাড়া রাফেজ মলে অবস্থিত স্বাভাবিক জীবাণুগুলির অবস্থানে পরিবর্তন ঘটিয়ে কোলন-ক্যানসার প্রতিরোধে অংশ নেয়; প্রতিরোধক হিসেবে দেহে খাদ্য বস্তু থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কতগুলি ক্ষতিকারক পদার্থের ক্ষয়বৃদ্ধি করে; গোটা গোটা গমে তৈরী চাপাটি, রুটি, আলু, শিম্বগোত্রীয় বীজ, বাঁধাকপি এবং নানা পত্র-সমৃদ্ধ তরকারীতে প্রচুর পরিমাণে রাফেজ বা আঁশ থাকে। কৃত্রিমভাবে পরিশুদ্ধ খাবারে রাফেজ থাকে না; পেষণ ও খোসা ছাড়ানো পদ্ধতিতে বিভিন্ন শস্য, শাকসবজি ও ফলকে রাফেজ মুক্ত করা হয়। উন্নত দেশগুলির রাফেজ মুক্ত রিফাইণ্ড ফুড খাওয়ার অভ্যাসটি আমাদের কাছে এখন আর অপরিচিত নয়। তাই তো প্রতিবছর ১০০—২০০ পাউণ্ড কোষ্ঠপরিষ্কারক ওষুধের ব্যবহার তাদের উপযুক্ত জরিমানা।

ছ. জল থেকে ক্যানসার : জলকে সাধারণত ক্লোরিনযোগে পরিশুদ্ধ করা হয় পেটের গোলমাল, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড বা ঐ জাতীয় কিছু রোগের হাত থেক রক্ষা পাওয়ার জন্যে। কিন্তু এটা আমরা অনেকেই জানিনা বা ভাবিনা যে কতগুলি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়াসে ব্যবহৃত ঐ পদার্থটিই আমাদের ঠেলে দেয় তার থেকে ঘোরতর কঠিন রোগের কবলে। জলে থাকে বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ। মিশ্রিত ক্লোরিন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরী করে কতগুলি হ্যালোজেনেটেড যৌগ। এবং এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে এ গুলির মধ্যে কয়েকটি ক্যানসার সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাকীগুলির সম্পর্কেও দানা বেঁধে উঠেছে। তাইত আজ শোরগোল এই বিশ্বজুড়ে। ভারতের মতো দেশে বেশির ভাগ মানুষের পক্ষেই জীবাণুমুক্ত জলের কথা চিন্তা করাটা যেন স্বপ্ন দেখারই সামিল। কারণ সে-জল আমরা পাচ্ছি কোথায়? তাই আমাশাকে জীবন সঙ্গিনী করে আমাদের ঘর করতে হয়। তা ছাড়া আমাশাকে জব্দ করতে প্রায়শই ব্যবহৃত কিছু কিছু ওষুধও ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে বলে বিজ্ঞানী মহলে সন্দেহ জেগেছে। যেমন, ডাই আয়োডোহাইড্রক্সি কুইনোলিন।

জ. সুপারি ও ক্যানসার : ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থের তালিকা থেকে বিজ্ঞানীরা সুপারিকেও বাদ দেন নি হঠাৎ চিন্তা করলে সত্যি অবাক হতে হয়। এই উপমহাদেশে মুখ, গলা ও অন্ননালী বা গ্রাসনালীর ক্যানসারের কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা অতিরিক্ত তামাক সহ পান সুপারি খাওয়ার অভ্যাসকে দায়ী করেছেন, শুধু কি ভারত? এশিয়ার অন্যান্য ক্রান্তীয় জলবায়ুপূর্ণ দেশগুলিতেও স্থানীয় অধিবাসীরা বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সহ পান-সুপারি চিবানোর কু-অভ্যাস থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারেন নি। ফলে মুখ-মাড়ি-গলা-গলবিলের ক্যানসার সে-সব দেশেও কম নয়। ১৯৫০ সালে শ্রীলঙ্কার বিজ্ঞানীগণ সুপারির বিভিন্ন গঠনগত উপাদানের বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহুরকম মুখগহ্বরের ক্যানসারের কথা আমাদের জানিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, ভারত এমন একটি দেশ যেখানে ১ লাখ লোকের মধ্যে মুখসংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের ক্যানসারে ভোগেন প্রায় ২১ জন। মুখগহ্বরের ক্যানসারের কারণ মোটেই পরিষ্কার নয়। তবে এইটুকু জানা গেছে, এই অঙ্গে ক্যানসারের জন্যে শুধু তামাক বা সুপারি চিবানোর কু-অভ্যাসই দায়ী নয়। দায়ী অন্যান্য দু' একটি ব্যাপারও। যেমন ধরুন, কোন তীক্ষ্ন দাঁতের দ্বারা মুখগহ্বরের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অনবরত খোঁচা লাগছে। কিংবা দাঁতকে শক্ত বা মজবুত রাখতে কোন ভাঙ্গা উপকরণ লাগানো হয়েছে বা উপকরণটি ঠিকমত লাগানো হয়নি ইত্যাদি। এছাড়া কোন দাঁতের পুনঃস্থাপনে অসঙ্গতি জনিত নিরন্তর উপদহন ও উত্তেজনা থেকেও রোগটি হতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা সুপারিস্থিত এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থই আসলে মুখগহ্বরের ক্যানসার সৃষ্টির কাজকে এগিয়ে দেয়। রাসায়নিক পদার্থটি মাইকোটক্সিন। বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকের ক্রিয়াকলাপে বিষটি তৈরী হয়। অ্যাফ্লাটক্সিন এক বিশেষ ধরনের মাইকোটক্সিন। নির্দিষ্ট কয়েকটি ছত্রাক দ্বারাই এর সৃষ্টি সম্ভব। যেমন—অ্যাসপারজিলাস ফ্লেভাস, অ্যাসপারজিলাস প্যারাসিটিকস ইত্যাদি। এই সর্বব্যাপী ছত্রাকগুলো তৈরী করে চার ধরনের অ্যাফ্লাটক্সিন—B_1, B_2, G, ও G^2। এর মধ্যে B_1 সবচেয়ে শক্তিশালী কার্সিনোজেন। এ-বিষয়ে বোম্বাই-এর ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা খুবই প্রসিদ্ধ। এখানে সুইজ্যারল্যাণ্ডের বিশেষ ধরনের নেংটি ইঁদুরের চামড়ার নিচে সুপারির গরম ও ঠাণ্ডা নির্যাস ঢুকিয়ে দিয়ে প্রায় ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে ফাইব্রোসরেকোমা হতে দেখা গেছে। প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, গ্লাইকোজেন, সায়ালিক

অ্যাসিড প্রভৃতি কয়েকটি জৈবরাসায়নিক পদার্থের পরিমাপে নেংটি ইঁদুরের লিভার, বৃক্ক, ফুসফুস, মাংসপেশী ইত্যাদি স্থানই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার পরিমাপে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি টিস্যুর নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন কমিয়ে আনার জন্যে দায়ী পলিফেনল। কোন কোন অবস্থায় ফুসফুসে ও বৃক্কে গ্লাইকোজেন ও সায়ালিক অ্যাসিডের ঘনত্বে হেরফের দেখা যায়। ফুসফুস ও বৃক্কের একদিকে যেমন গ্লাইকোজেনের ঘনত্ব কমে, অন্যদিকে তেমনি সায়ালিক অ্যাসিডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। ঘটনাটি ঘটে সুপারির নির্যাসের দ্বারা পরীক্ষা চালানোর পরবর্তীকালে। নেংটি ইঁদুরের দেহে সালফহাইড্রিল গ্রুপের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিভিন্ন উৎসেচকের উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া তাঁরা সুপারিস্থিত উপক্ষার এরিকোলিন সহ তার জলীয় ও পলিফেনল অংশ নেংটি ইঁদুরের দেহে ঢোকানোর পরে লিভার, বৃক্ক, ফুসফুস ও মাংসপেশীতে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে গ্লুটাথিয়ন প্রোটিন—SH, প্রোটিন—SH+S—S প্রভৃতি উপাদানের তারতম্য লক্ষ্য করেন। তারও পরে বিজ্ঞানীরা সুপারির নির্যাসের অন্যান্য কয়েকটি অংশ পরীক্ষাধীন ইঁদুরের কলা-কোষে ঢুকিয়ে গ্লুটাথিয়ন ও প্রোটিন—SH-এর পরিমাণে তারতম্য পরীক্ষা করেন। দেখা যায়, প্রথমটি বাড়ছে অথচ দ্বিতীয়টি কমছে। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া এও দেখা গেছে যে সুপারি পরীক্ষাধীন প্রাণীদেহে ক্যানসার সৃষ্টিকারী শ্লৈষ্মিক পদার্থ সংশ্লেষ করে ক্যানসারের উদ্ভব ত্বরান্বিত করে। সম্প্রতি তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত সুপারি থেকে এক ধরনের অধিবিষ বা টক্সিন নিঃসরণ সম্ভব হয়েছে। তাঁরা বিষটির নাম দিয়েছেন 'পাতুলিন'। এটি এক বিশেষ ধরনের ট্রিগারিং পয়েণ্ট বা ক্যানসার উদ্দীপক। মুখগহ্বর ও অন্ননালীর ক্যানসার সৃষ্টিকারী আসামীর তালিকা থেকে বিজ্ঞানীরা পাতুলিনকেও বাদ দেননি।

তবে কি সুপারি খাওয়া ছেড়ে দেওয়া ছাড়া এর আর অন্য কোন প্রতিকার নেই? আছে। বিজ্ঞানীরা আমাদের সে পথের সন্ধান দিয়েছেন। খুবই সহজ পথ। সুপারিগুলি একটু বেছে খেতে হবে। অর্থাৎ সতর্ক থাকতে হবে যেন তাতে কোন খারাপ গন্ধ না থাকে; সুপারির রং যেন অস্বাভাবিক না হয়। কালো, হলুদ, সবুজ, ধূসর ছাই প্রভৃতি বর্ণকে এখানে অস্বাভাবিক বর্ণের আওতায় ফেলা হয়েছে। কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত এই কারণে যে সুপারি ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেলেই ক্রেতাদের বোকা বানিয়ে দেবে।

তারা ক্ষতিকর ছত্রাকে আক্রান্ত সুপারিগুলিতে বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম সুগন্ধি ও রং ব্যবহার করে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। মনে রাখা দরকার, বিপদের সীমা কিন্তু এতে দ্বিগুণ বাড়ে। একদিকে, ছত্রাক, অন্যদিকে কৃত্রিম সুগন্ধি ও রং সবই সম্ভাব্য কার্সিনোজেন—অর্থাৎ ক্যানসার সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া আমরা এখন শুধু সুপারিতেই তৃপ্ত থাকতে পারি না। সঙ্গে চাই মৌরি, জোয়ান ইত্যাদি যতসব মুখরোচক মশলা। ইংরেজিতে এগুলি ফিনেল (fennel) নামে পরিচিত। এই ফিনেলেও থাকে দু' একটি অ্যাফ্লাটক্সিন সৃষ্টিকারী ছত্রাক। চিকিৎসকদের মতে, পান-সুপারি চিবানোর অভ্যাস যে শুধু ক্যানসারই ডেকে আনে তা নয়, মুখের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করে অন্যান্য রোগ সৃষ্টিতেও এরা বেশ পটু। চিকিৎসকদের মতে এরোগ প্রতিরোধের সিংহভাগই জনসাধারণের হাতে, অর্থাৎ তাঁরা এ কু-অভ্যাস ছেড়ে দিলে সত্যিই রোগটি কমিয়ে আনা সম্ভব। আর তা না হলে বিকল্প, কম বিপজ্জনক ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা বলতে এক, অভ্যাসের মাত্রা কমানো ; দুই, পান, সুপারি বা ফিনেল যাইহোক মুখে পোরার আগে একটু দেখে নেওয়া ; তিন, বাড়িতেই ব্যবস্থা রাখা (যাতে ইচ্ছেমত দেখে শুনে খাওয়া যায়)। মনে রাখা দরকার, পান-সুপারি মুখের মধ্যে রেখে দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

ঝ. হরমোন পিল : যদি বলি, অন্যান্য খাবারের সঙ্গে পিলও বর্তমানে শিক্ষিতা, শহুরে মহিলাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অংশীভূত হয়েছে, নিশ্চয়ই ভুল হবে না—যদিও পিলকে প্রকৃত খাদ্য বলা যায় না, বরং বলা যায় প্রতিষেধক। তবে এখন আর এর জনপ্রিয়তা শুধু তথাকথিত আলোক প্রাপ্ত বা 'এলিট' সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিরক্ষর গ্রামীন মহিলারাও আজ পিল সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী এবং ওয়াকিবহাল। 'মায়াবড়ি' 'কল্পনাবড়ি' নামেও পিলের প্রচার বেশ কানে আসে। পিলে থাকে দু' ধরনের হরমোন—ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন। নিয়মিত ব্যবহারে সেগুলি মেয়েদের স্তনের কোষকলার দ্রুত বিভাজন ঘটায়। বিভাজনের সময় এমন কিছু ঘটে যাতে কোষগুলি তাদের স্বাভাবিক ধর্ম হারিয়ে ক্যানসার কোষে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, স্তনের ক্যানসারের কারণ হয়ত এটাই। যে সব পিলে উচ্চ মাত্রায় (0.0৭৫—0.১ mg) ইস্ট্রোজেন থাকে দীর্ঘকাল সেগুলির নিয়মিত ব্যবহারে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা এমন

কি ক্যানসার-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই পরবর্তীকালে এর মাত্রা কমিয়ে ৫০ ug-এ আনা হয়। সম্প্রতি এই মাত্রা আরও কমানো হয়েছে। পরিমাণ প্রায় ৩০ ug। দেখা গেছে, শুধু প্রজেস্টেরন যুক্ত পিল একটু বেশি বয়সের নারীদের পক্ষে খুবই উপকারী। তারা এটি দীর্ঘকাল ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ প্রজেস্টেরণ জরায়ুর ক্যানসার প্রতিরোধ করে। প্রসঙ্গত ভারতে জরায়ু বা জরায়ু মুখের ক্যানসারের সংখ্যা মোটেই কম নয়। সাধারণত অনুন্নত দেশে যৌনাঙ্গের অপরিচ্ছন্নতা এ রোগের প্রধান কারণ। পূর্ণাঙ্গ যৌনজীবন সংগঠনে সক্ষম একটি নারীর বয়স গড়ে হওয়া উচিত ২০ বছর। এর আগে বিয়ে হলে বিপদের আশংকা থাকে। বেশি বয়সে যৌন সংযোগ হলেও যদি কোন মহিলার সঙ্গে বহু পুরুষের সঙ্গ হতে থাকে তবে এরোগের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়া অধিক সন্তানের জননীর ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবকালে জরায়ুমুখ বারবার ছিঁড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে এবং হয়ও তাই। এক্ষেত্রে এই বারবার ছিঁড়ে যাওয়া বা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত ক্যানসার ডেকে আনতে পারে। অল্প বয়সে বিয়ে বা অধিক সন্তান উৎপাদন কোনটিই নারীজীবনের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, পুরুষের জননাঙ্গের ত্বকের নিচে ক্ষরিত রস স্মেগমাও (smegmo) এ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা অবশ্যই কাম্য।

৬. মনোজগত ও ক্যানসার ঃ

বিচিত্র। সত্যি বিচিত্র এই ক্যানসারের জগত। যে ক্যানসার নিয়ে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের মাথা ব্যাথার অন্ত নেই, সেই ক্যানসারের সূত্রপাত কি স্ফূর্তির অভাব থেকেই? হ্যাঁ, ১৯৭৮ সালে আমেরিকান বিজ্ঞান পত্রিকা 'সায়ান্স'-এ ঠিক এই ধরনের এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সে কি হৈ চৈ। আমাদের মতো সাধারণ লোকের মনে একটি প্রশ্ন খুবই ভীড় করে। পৃথিবীর শুধু বেছে বেছে কয়েকটি লোকের ক্যানসার হয় কেন? এ নিয়ে প্রথম চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় ১৯৪৭ সালে। ক্যারোলিন বেডেল নামে এক মার্কিন মহিলা মনোবিজ্ঞানী সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন, যে-সব মহিলা ক্যানসারে ভুগছেন তাদের মানসিক গঠন অনেকটা আত্মহত্যা প্রবণ রোগিনীদের মতোই। সাতের দশকের গোড়ার দিকে এই নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ডাঃ কিসেন।

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেন হিসেবটা ঠিক মিলছেনা। যারা প্রচুর ধূমপান করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ক্যানসারকে এড়িয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। অথচ এমন অনেক ফুসফুসের ক্যানসরের রোগী পাওয়া যাচ্ছে যারা খুব অল্পই ধূমপান করেন। চলল নানা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ডাঃ কিসেন দেখলেন, যারা সবসময়ই মনমরা হয়ে থাকেন, কোন ব্যাপারেই যারা ঠিকমত উৎসাহ পান না, তাঁরাই কিন্তু বেশি ক্যানসারের শিকার হন—তাঁরা যতই কম সিগারেট খান না কেন।

ডাঃ কিসেন-এর কাজের সূত্র ধরে পরীক্ষা শুরু করলেন অন্যান্য শরীর বিজ্ঞানীরা। দেখলেন, যারা অল্প ধূমপান করেই ক্যানসারের কবলে পড়ছেন তাদের রক্তে একটা বিশেষ উৎসেচক AHH-এর পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। AHH-এর পুরো নাম—অ্যারাইল হাইড্রোকার্বন হাইড্রক্সিলেজ। বিজ্ঞানীরা বললেন, এই উৎসেচকের কাজ সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে ফুসফুসে যাওয়া হাইড্রোকার্বনকে এক নতুন যৌগে পরিবর্তিত করা। আশ্চর্যের কথা, এই উৎসেচকের তারতম্য কিন্তু বংশগতির ধারার চেয়ে মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের কোষ থেকে বেরিয়ে আসা বিশেষ হর্মোনের সঙ্গে বেশি সম্পর্কযুক্ত। দেখা গেছে, কয়েকটি বিশেষ মানসিক অবস্থায় মস্তিষ্ক থেকে হর্মোনটির বেরিয়ে আসার পরিমাণে তারতম্য হয়। ফলে তারতম্য আসে রক্তেও। আবার এও জানা গেছে, যারা হতাশা জনিত রোগে ভোগেন তাদের রক্তে এই উৎসেচকের পরিমাণও বেশি।

শুধু ফুসফুসের ক্যানসারই নয়, রক্তের এক ধরনের ক্যানসার এবং হজাকিন বর্ণিত ব্যাধি নিয়ে গবেষণা চালালেন মার্কিন মুলুকের রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডাঃ উইলিয়াম গ্রিন। ইনি বললেন, যারা অতীতে নানারকম দুঃখ, হতাশা বা নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তারাই এ রোগে বেশি ভোগেন। একই রকম তথ্য পেলেন লণ্ডনের কিং কলেজ হাসপাতালের ধাত্রীবিদ্যার গবেষক ডাঃ গির ও ডাঃ মরিস। তাঁরা দেখলেন, যেসব মেয়েরা বেশি হাসি-খুশী, মনের ভাব চটপট প্রকাশ করে ফেলে তাদের মধ্যে ক্যানসারের ঘটনা অনেক কম। কিন্তু স্বভাবতই একটা প্রশ্ন মনে জাগে, মনমরা হয়ে থাকার সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক কী? ১৯৭৮ সালে আমেরিকার জাতীয় ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ বার্নার্ড ফক্স নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে

এলেন। বললেন, মস্তিষ্কের মধ্যে হাইপোথ্যালামাস বলে বিশেষ এক জায়গায় হয়ত গণ্ডোগোলের সূত্রপাত হয়। শরীরের যে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তার প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হাইপোথ্যালামাস। তাঁর মতে, মানসিক নানা ব্যাপার স্যাপারের সঙ্গেও হাইপোথ্যালামাস-এর সম্পর্ক আছে। দীর্ঘদিন ধরে মনমরা হয়ে থাকলে তার সুদূর প্রসারী ফল হিসেবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর সেই ফাঁকে শরীরে ঢুকে পড়ে ক্যানসার সৃষ্টির নানা এজেন্টরা। অবশ্য ডাঃ ফক্সের মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। ক্যানসারের মতো মারাত্মক ব্যাধির মোকাবিলার নিশ্চিন্ত কোন অস্ত্র আমাদের হাতে নেই। তাই যদি মনের স্ফূর্তিতে এর কোন প্রতিরোধের কাজ হয়, তবে হাসিখুশি থাকতে আর দোষ কি!

৭. বংশগতির ভূমিকা :

ক্যানসার বংশগত কিনা এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভাবনার অন্ত নেই। কোন স্থির সিদ্ধান্তে তাঁরা আজও আসতে পারেন নি। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মানুষের শরীরে অসংখ্য জিন রয়েছে। গঠনে জিনগুলোর প্রতিটি রাসায়নিক উপাদান শৃঙ্খলের মত। DNA নামক জৈব উপাদানটি জিনের এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। DNA-কে আবার চার ভাগে বিভক্ত করা চলে। এগুলোকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় C, G, A ও T বলে উল্লেখ করা হয়। জিনের এই বিভাগ বা শাখাগুলির কাঠামোগত অবস্থানের মাধ্যমে জিনের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয় এক ধরনের সাংকেতিক বার্তা। ঐ সাংকেতিক বার্তাই জিনের কাজকর্মের ধর্মটিকে তুলে ধরে। মানুষের মূত্রাশয়ের ক্যানসারের ওপর মার্কিন বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এতে ৬ হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ বা শাখা পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন, ৬ হাজার শাখার মাত্র একটিতে পরিবর্তনের ফলে শরীরে মূত্রাশয়ের ক্যানসার সৃষ্টি হচ্ছে। চূড়ান্ত পরীক্ষার পর তাঁরা বলেছেন, আক্রান্ত শাখাটিতে 'গুয়ানিন নিউক্লিওটাইড'-এর বদলে থিয়াসিন নিউক্লিওটাইড সৃষ্টি হয়। জিনের এই অদ্ভুত পরিবর্তনের ফলে এক প্রোটিনের জায়গায় অন্য প্রোটিন তৈরী হয়ে থাকে। সম্ভবত তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ক্যানসার টিউমারের জন্ম। অর্থাৎ শরীরে মোট ৬০০ কোটি কোষের মাত্র একটির অস্বাভাবিকতার জন্যে সৃষ্টি হচ্ছে ক্যানসারের মত মারাত্মক রোগ।

দেখা গেছে, কোষের মারক চরিত্র তার বংশগতি উপাদানের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতার ম্যালিগন্যাণ্ট্ টিউমার সৃষ্টিকারী জিন অপত্য বংশে ফেনোটিপিক ক্যারেকটার বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য রূপে প্রকাশ পায়। কিছু জিনোটিপিক ক্যারেকটার বা জিনসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের জন্যেই সাধারণত এটা হয়ে থাকে। ১৯২৭ সালে প্রথম জিন পরিব্যাক্তি বা মিউটেশনের ব্যাখ্যা দেন বিজ্ঞানী মুলার। ইনি জিন মিউটেশন ঘটিয়েছিলেন বিকিরণ পদ্ধতিতে। পরে ১৯৪৪ সালে ঠিক একই ঘটনার কথা বলেন আরো দুজন বিজ্ঞানী। নাম আরবাচ ও রোবসম। তবে তাঁরা জিন মিউটেশন ঘটান অন্য পদ্ধতিতে, কোষে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে। এখন প্রশ্ন হল, পরিব্যাক্তিকারী পদার্থ বা মিউটাজেনিক এজেণ্ট কি ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে? এই তো সেদিনকার কথা যেদিন প্রশ্নটির উত্তর আমাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। কিন্তু আজ? আজ উত্তরটি আমরা জেনে ফেলেছি। বিজ্ঞানীদের মতে পরিব্যাক্তি পদার্থ বা মিউটাজেনিক এজেণ্ট সাধারণ কার্সিনোজেনগুলোর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁরা বলেন, বিকিরণ রাসায়নিক পদার্থ বা ভাইরাস এই তিনটির যে কোন একটির প্রভাবে দেহকোষ ক্যানসার কোষের রূপ নিতে পারে। স্বভাবতই বলা যেতে পারে, পদার্থগুলি এখানে বন্দুকের ট্রিগারিং পয়েণ্টের মতো কাজ করেছে।

৮. জিনের ত্রুটি :

বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, জিনের ত্রুটির জন্যে শিশুদের বৃক্কে টিউমার হয়। যার পরিণতি ক্যানসার। তবে প্রথমে ধরা পড়লে চিকিৎসায় তা নিরাময় হয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, স্তনেও ঠিক এই ধরনের ক্যানসার হয়ে থাকে। কারণ সেই জিনের ত্রুটি। বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, ক্যানসারে আক্রান্ত ২২টি রোগীর মধ্যে ১২টির মূলেই রয়েছে জিনগত দোষ। সিনসিনেটি (Cincinnati) কলেজ অব মেডিসিন-এর মলিকিউলার বায়োলজি বিভাগের বিজ্ঞানী ডাঃ ওয়েবস্টার কর্নাভিনর মতে, প্রতি ১০ হাজারে একজন লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন কি ধরনের জিনগত দোষ থাকলে শিশুকালেই ক্যানসার হতে পারে। এছাড়া কোন শিশুর জিনগত ত্রুটি আছে এটা পূর্বাবস্থায় ধরতে পারলে তা নির্মূল করা সম্ভব। কথাটি বলেছেন বোস্টনের এক ক্যানসার ইনস্টিটিউটের ডঃ স্টুয়ার্ট

অর্বিনো। আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি তার প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্টে জানিয়েছে, এ ধরনের ক্যানসারের ৭০ শতাংশই সারিয়ে তোলা সম্ভব।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, যে কোনভাবেই হোক ক্রোমোজোমের গঠনগত পরিবর্তন ঘটাতে পারলেই কোষ-বিভাজনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়। বিভাজন অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ সুস্থ স্বাভাবিক কোষ মারক টিউমারের রূপ নেয়। আর এটা আমাদের এখন সকলেরই জানা যে, মারক টিউমার ক্যানসার ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সাধারণ কোষের ক্রোমোজোম কিন্তু মোটেই ক্যানসার কোষের সদৃশ নয়। ক্যানসার কোষের ক্রোমোজোমগুলো **ট্রাইরেডিয়াল, ডাইসেন্ট্রিক** এমন কি গোলও হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে লিউকেমিয়া হয়েছে এমন রোগীর রক্তস্থ ক্রোমোজোমের কথা বলা যেতে পারে। এই ক্রোমোজোমগুলো যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। এদের **ক্যারিওটাইপিক** বৈচিত্র্য অর্থাৎ ক্রোমোজোমের সংখ্যায় তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এবার আসা যাক বারকিট লিম্ফোমাস্থিত ক্রোমোজোমের কথায়। বারকিট লিম্ফোমার সূত্রপাত চিবুকাস্থিতে (mandible)। এখানে এর অবস্থিতি লসিকাবহির্ভূত বা এক্সট্রালিম্ফ্যাটিক টিউমার হিসেবে। তবে ক্রোমোজোমটি কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও বেশ পরিচিত। এর লম্বা বাহুর একপ্রান্তে একটি গৌণভাজ (secondary constriction) থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ক্যানসার কোষের নিউক্লিয়াস স্বাভাবিক কোষের থেকে আলাদা।

(1) ট্রাইরেডিয়াল (Triradial): অনেক সময় কতগুলি কোষের আচ্ছাদক অংশ তিনদিকে একে অপরের সঙ্গে ১২০° কোণ করে বাড়তে থাকে তখনই সেই বিশেষ কোষগুলিকে ট্রাইরেডিয়াল বলা হয়।

(2) ডাইসেন্ট্রিক (Dicentric): কোন কোষে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার (centromere) থাকলে তাকে ডাইসেন্ট্রিক বলে।

ক্যানসার কোষে এক নতুন ধরনের জিনের সন্ধান মিলেছে। নাম, অঙ্কোজিন। কোন কোন ক্যানসার কোষে এর সংখ্যা আবার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। বিজ্ঞানীদের ধারণা অঙ্কোজিন কোষে মাত্রাতিরিক্ত জিনের সংশ্লেষ ঘটিয়ে সাধারণ কোষকে ক্যানসার কোষে রূপান্তরিত করে। তাই অনেক টিউমার কোষে জিনের সংখ্যা তুলনামূলক বিচারে অনেক বেশি। এছাড়া টিউমার কোষের অনিয়মিত ছন্নছাড়া বিভাজন ও বৃদ্ধির মূলেও রয়েছে সেই অঙ্কোজিনই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আমাদের প্রত্যেকের দেহেই এই জিনগুলি

উপস্থিত। তবে আশার কথা হল, বেশির ভাগ সময়েই দেহে জিনগুলি থাকে সুপ্ত অবস্থায়। এই সুপ্তি কোনভাবে কেটে গেলেই কিন্তু বিপদ। প্রশ্ন হল, কিভাবে জিনগুলি জেগে ওঠে? এ ব্যাপারে ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউটের গবেষণা বেশ প্রসিদ্ধ। সংস্থাটির প্রধান গবেষক তথা বিজ্ঞানী মারিআনো বারবাসিড তাঁর কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে এর ওপর গবেষণা চালান। গবেষণা চলত গিনিপিগের দেহকোষের ওপর। তাঁরা চার ধরনের বিভিন্ন ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থের কথা আমাদের জানিয়েছেন। এগুলির যে-কোন একটির প্রভাবে দেহস্থ অঙ্কোজিন উত্তেজিত হতে পারে। উত্তেজনার পর জিনগুলির সুপ্তি ভাঙ্গে এবং জেগে উঠে তারা কাজ শুরু করে দেয়। তারপর? সুস্থ স্বাভাবিক কোষ ক্যানসার কোষের রূপ নেয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, একই পরিবারভুক্ত লোকেদের মধ্যে এই আশঙ্কা মোটেই কম নয়। এখন প্রশ্ন জাগে, কী বা কোন পদার্থ সাধারণ জিনকে অঙ্কোজিনে পরিবর্তিত করতে পারে? উত্তরটি দুভাবে দেওয়া যেতে পারে। এক, জিনের মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন। দুই, যে কোন মুহূর্তে প্রকৃতিগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধরনের জিন সৃষ্টি। দুটো উত্তরের মধ্যে সঠিক একটি এবং সেই সঠিক উত্তরটিরই সন্ধান করতে হবে বিজ্ঞানীদের।

(৫) শিল্পায়নের সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক :

হিসেব অনুযায়ী এদেশে প্রতি বছর পাঁচলাখ লোক নতুন করে ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু কেন? এর কারণ কি? হিসেব নিকেশ করে দেখা যায়, এই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে শিল্পায়নে অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে। বিভিন্ন কীটঘ্ন, আলকাতরা, অ্যানিলিন রং, এক্সরে, বেঞ্জিন, ব্যাটারিতে ব্যবহৃত ধাতু ক্যাডমিয়াম, নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর থেকে আগত অশুদ্ধি, কলকারখানার দূষিত ধোঁয়া, বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে কলকারখানা থেকে বেরিয়ে পরিবেশে (জলে, বাতাসে) মিশছে। দিনে দিনে কলকারখানার সম্প্রসারণ যেমন হচ্ছে পরিবেশে এদের পরিমাণও তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্গে বাড়ছে ক্যানসার।

রাসায়নিক ক্যানসার সৃষ্টিকারক যেমন—PAH, আরসেনিক ও অন্যান্য ধাতবপদার্থ, অ্যাসবেস্টস ইত্যাদি মানব শিল্পসভ্যতার উন্নতির পূর্বে থেকে এমন কি পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই বিরাজ করছিল। সঙ্গে রয়ে গেছে প্রাকৃতিক বিকিরণ। শিল্প ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি পরিবেশে ক্যানসার সৃষ্টিকারক পদার্থের (যেমন—বেনজাপাইরিন বা

BAP, অ্যাসবেস্টস, নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ, DDT, ভিনাইল ক্লোরাইড ইত্যাদি) উৎসগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশের এক বিরাট অংশ দূষিত হওয়ার কারণ হল শিল্পাঞ্চলের ব্যাপক এলাকা থেকে বর্জ্যপদার্থ নিষ্ক্রমণ দুর্ভাগ্যের বিষয়, শিল্পাঞ্চল থেকে নির্গত বা শিল্পে ব্যবহৃত ক্যানসার সৃষ্টিকারক পদার্থগুলি মানুষের ক্যানসার সৃষ্টি করছে, এই ধারণা জনমানসে আজও যথেষ্ট তীক্ষ্ন নয়। ফলে বহুক্ষেত্রে দূষণ বিরোধী আইনগুলি মান্য করা হয় না। রোগের প্রকোপ সম্পর্কিত অনুশীলনের সাহায্য নিলে দূষণের উৎস, ব্যাপকতা ও গভীরতার সঠিক নিরূপণ সম্ভব। একথা ঠিক যে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে শিল্প থেকে ক্যানসারের প্রসার প্রতিহত করার জন্যে বর্জ্য পদার্থমুক্ত শিল্প পদ্ধতি, যথা সময়ে তাদের পরিশোধন, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দূষণ রোধের প্রচেষ্টা, বিকল্প উপাদান ও পদ্ধতির ব্যবহার ইত্যাদি পথের কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু ভাবা আর সেগুলিকে কার্যকর করার মধ্যে ফাঁক অনেক। বর্তমানে পরিবেশে যে সব ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে সেগুলিকে দূরকরা খুব কঠিন কাজ।

এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসেবে ২-ন্যাপথিলামিনের (2-nepthylamine) নাম করা যেতে পারে। পরিবেশে কোন রাসায়নিক ক্যানসার সৃষ্টিকারক পদার্থ কতটা আছে তা নির্ধারণ করা বেশ শক্ত। MPC স্ট্যাণ্ডার্ড নির্ভুল না হলেও হয়ত এটাই সন্দেহাতীতভাবে ক্যানসার সৃষ্টিকারক পদার্থ কমিয়ে মানুষকে ক্যানসারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

(৬) শুরুতে ধরা পড়লে ক্যানসার সারে ঃ

আমরা সকলেই জানি, ক্যানসার রোগ নির্ণয় আজও এক বড় রকমের সমস্যা। এও জানি, শুরুতে ধরা পড়লে রোগটি সারিয়ে তোলা যায়। কিন্তু সত্যিই কারও ক্যানসার হয়েছে কিনা বোঝা যাবে কি করে ? তা বুঝতে হলে ডাক্তারদের কয়েকটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে বা তাঁদের নির্দেশ-মত নিম্নোক্ত কয়েকটি ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে—

ক্যানসারের সঙ্কেত ঃ

১· কারো শরীরে ক্ষত হয়েছে, প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে এমনকি প্রচুর অ্যাণ্টিবায়োটিকের সাহায্য নিয়েও সে ক্ষত সারছে না। বুঝতে হবে, ও ধরনের ক্ষত থেকে ভবিষ্যতে ক্যানসার হতে পারে।

২. শরীরের কোথাও তিল বা আঁচিল রয়েছে। দেখাগেল, ঐ তিল বা আঁচিল মাঝেমাঝেই চুলকোয়। চুলকানোর পর সেখান থেকে রস বেরোয়। কোন অবস্থায় এমনও হতে পারে যে আঁচিলটা তার বর্ণ বা আকার পরিবর্তন করছে।

৩. মুখে, জিভে অথবা ঠোঁটে ঘা হয়েছে। সাধারণ চিকিৎসায় সহজে সারছে না।

৪. কিংবা কারো হয়ত স্বরভঙ্গ, গলায় ব্যাথা বা কাশি হয়েছে। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও সারছে না। এই অবস্থায় খাবার গিলতেও অসুবিধা হয়।

৫. কারো মলের সঙ্গে নিয়মিত রক্ত পড়ছে বা প্রস্রাব ও মলত্যাগের অভ্যাসে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হাজার চিকিৎসাতেও ফল পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটি সন্দেহজনক। পর্যায়ক্রমে তীব্র কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও উদরাময় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৬. চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে বদহজম হচ্ছে যা ওষুধে সারছে না। খাদ্য গ্রহণের স্পৃহা ধীরে ধীরে কমছে।

৭. পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে কাশি, দ্রুত ওজন হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কাশি রক্ত মেশানো হতে পারে।

৮. মেয়েদের মাসিকের সময় ছাড়াও অনিয়মিত রক্তস্রাব, সহবাসের পর যন্ত্রণা ও রক্তপাত, খুব বেশি দুর্গন্ধযুক্ত সাদাস্রাব, ঋতু নিবৃত্তির পর মাঝে মাঝে রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সাধারণ চিকিৎসায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছে না। লক্ষণগুলি ক্যানসারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

৯. মেয়েদের স্তনের কোনস্থানে বেদনাহীন পিণ্ড বা স্ফীতি দেখা দিয়েছে। কিংবা হয়ত স্তনের কোন অংশ হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছে। এমনকি এও হতে পারে, ৩৫ – ৫০ বছরের মেয়েদের স্তনের বৃন্তটি আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, এগুলির যে কোন একটির বহিঃপ্রকাশ ক্যানসারের পূর্বলক্ষণ সূচিত করে।

১০ স্তনের বৃন্ত বা শরীরের অন্য কোন প্রাকৃতিক ছিদ্রপথে অনিয়মিত রক্তপাত কিংবা রস নিঃসরণ হচ্ছে।

১১. নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটছে।

উপরোক্ত লক্ষণগুলির কোন একটির প্রকাশ পাওয়ার অর্থ এই নয় যে ক্যানসার হয়েছে। তবে এগুলির কোনটা দেখা দিলে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের

পরামর্শ নেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ক্যানসার-কোয়্যাক বা ক্যানসার হাতুড়েরা যারা চটকদার বিজ্ঞাপনের সাহায্যে নিজেদের জাহির করে তাদের সম্পর্কে সাবধান হওয়া উচিত। ক্যানসার দ্রুত বৃদ্ধি পায়. সুতরাং অযথা দেরি করার অর্থ রোগকে দুরারোগ্য করে তোলা।

(৭) **প্রতিকার :**

এত কিছুর পরও প্রশ্ন একটি রয়েই গেল। সেটি হল ক্যানসারের প্রতিকার। এই প্রতিকার খোঁজা নিয়ে বিশ্বের তাবড় তাবড় ক্যানসার বিশেষজ্ঞগণ বহুকাল থেকেই চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। সঠিক উত্তর মিলছে না। তবু লড়াই চলছে। এ লড়াই তুমুল লড়াই। আর তার সীমা এখন তুঙ্গে। ক্যানসার প্রতিষ্ঠানগুলির তৈরী লাখ লাখ ওষুধের বেশির ভাগই বাতিল হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের জেদও বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে বাড়ছে রোগের জটিলতা ও মৃত্যুর হার। তবে কি বলব, বিজ্ঞানীদের সব চেষ্টাই বিফলে? এ ব্যাপারে বিজ্ঞান আমাদের কিছুই দিতে পারেনি? না তা নয়। আসলে বিভিন্ন দিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ক্যানসার গবেষণা বা চিকিৎসায় অগ্রগতি সমানুপাতিক নয়। জনসাধারণের মনে ওপরের প্রশ্নগুলি জাগছে ঠিক সেই কারণে। যাই হোক, বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা জানতে পেরেছি রোগটি কী, কী তার বৈশিষ্ট্য, ক্যানসার প্ররোচক পদার্থ কোনগুলো, দেহের কোথায় কোথায় বেশি হয় বা হতে পারে, রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলিই বা কী ইত্যাদি। এছাড়া রোগটির সম্ভাব্য কারণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা করার শক্তিতো আমাদের যুগিয়েছে বিজ্ঞানই। অল্প দিনের কথা, ওয়াশিংটনে ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক ক্যানসার কংগ্রেসে বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ক্যানসার প্রতিরোধে কী ধরনের খাদ্যগ্রহণ ও কাজের পরিবেশ দরকার সে বিষয়ে প্রাথমিক সুপারিশও ঐ কংগ্রেসে করা হয়েছিল। কিছু বিজ্ঞানীর মতে, খাদ্যাভ্যাস ও কাজের পরিবেশ পরিবর্তনে কয়েক ধরনের ক্যানসার আক্রমণ অনেকটা প্রতিহত করা যেতে পারে। জনসাধারণকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত-কয়েকটি পদার্থ ব্যবহার সম্পর্কে তাঁরা সচেতন করে দেন। যেমন—বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, গুঁড়ো সাবান ও অন্যান্য পরিষ্কারক, সংরক্ষিত খাদ্য, সিগারেট বা অন্যান্য তামাকযুক্ত পদার্থ ইত্যাদি। এ ছাড়াও কয়লাখনি, ইউরেনিয়াম খনি, সুতার

কল ও ফটোগ্রাফির দোকানে কাজ করার ব্যাপারেও তাঁরা জনসাধারণকে সাবধান হতে বলেছেন।

(৮) ক্যানসারের চিকিৎসা :

নিচে ক্যানসার চিকিৎসার বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিভিন্ন দিকগুলি একে একে তুলে ধরা হচ্ছে :

১. **সার্জারি :** বিজ্ঞানীদের ধারণা ক্যানসার নিরাময়ে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হল অস্ত্রচিকিৎসা। স্তনের ক্যানসারের প্রতিকারে এই পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। স্তনের টিউমার ক্যানসার সম্পর্কিত হলে তার প্রতিকার ব্যবস্থা স্তন অপসারণ বা মাসটেকটমি। এই অপারেশনে শুধু আক্রান্ত স্তনই নয়, সংশ্লিষ্ট কলা ও বুকের পেশীরও অপসারণ প্রয়োজন। কিছু চিকিৎসকের অভিমত, শুধুমাত্র পিণ্ডের অপসারণ দ্বারাই অপারেশন সমাধা হতে পারে। আবার কারও মতে আংশিক স্তন অপসারণ করলেই চলে। এতে মানসিক চাপ অনেকটা লাঘব হতে পারে—যদিও আংশিক স্তন অপসারণের ফলে পুনর্বার ক্যানসারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। ডাক্তারেরা তাই একে এড়িয়ে চলতে চান। প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে নবকলার নির্মূলীকরণে জরায়ুর ক্যানসার থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

২. **বিকিরণ চিকিৎসা বা রেডিও থেরাপি :** সঠিক মাত্রায় এক্স-রশ্মির ব্যবহার ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে। স্তনের ক্যানসার রুখতে রেডিও থেরাপি বেশ জনপ্রিয়। তেমনি শুরুতে ধরা পড়লে এই পদ্ধতিতে জরায়ুমুখের ক্যানসারও প্রতিহত করা সম্ভব। জরায়ু কানসারের পূর্ণ নিরাময় বাস্তবিকই দুরূহ। যাই হোক, এ রোগে গামারশ্মি প্রয়োগের ফল খুবই ভালো। জরায়ুর ভিতরে ও জরায়ুমুখে কিছুটা রেডিয়াম নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দিয়ে আবার খুলে নেওয়া হয়। এটা এক ধরনের বিশেষ থেরাপি। আজকাল হাতে করে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার না করে ক্যাথিট্রন (cathetron) যন্ত্রের সাহায্যে রেডিয়ামের অনুরূপ কোবাল্ট বা কেসিয়ামের আইসোটোপ ছোট ছোট গুলির আকারে সরু নলের মধ্য দিয়ে জরায়ুতে সন্নিবিষ্ট করা হয়। এছাড়া টেলেগামা থেরাপিতে তলপেটের বাইরে থেকে যন্ত্র করে জরায়ুর চারপাশকে রোগমুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে সারাবিশ্বে এই চিকিৎসায় ৮০ শতাংশের বেশি রোগাক্রান্ত মহিলাকে নিরাময় করা যাচ্ছে।

নারীসমাজ সচেতন হলে শতকরা ১০০ জনকেই নিরাময় করা সম্ভব হবে বলে ক্যানসার চিকিৎসকদের ধারণা।

৩. **কেমোথেরাপি ঃ** এই চিকিৎসার পরিধি অনেকটা বিস্তৃত। যেমন ধরাষাক, বিভিন্ন অ্যাণ্টিবায়োটিক, অ্যালকিলেটিং এজেণ্ট, উৎসেচক, স্টেরয়েড হর্মোন, উপক্ষার বা অ্যলেকালয়েড, ইণ্টারফেরন এবং রেডিও কেমোথেরাপি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। ক্যানসার প্রতিরোধে এগুলির ভূমিকা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা হল—

ক. **অ্যাণ্টিবায়োটিক ঃ** এরা ক্যানসার কোষের DNA সংশ্লেষে বাধা সৃষ্টি করে। দু-ধরনের DNA-ই এর মধ্যে পড়ে। একটির সংশ্লেষ DNA-নির্ভর। অন্যটি RNA-র ওপর নির্ভরশীল। অ্যাকটিনোমাইসিন D থেকে শুরু করে ব্লিওমাইসিন, অ্যাডরিওমাইসিন, ডউলোমাইসিন, নগ্যালামাইসিন, ক্লিওমাইসিন, মিথ্রামোইসিন, অ্যাথ্রামাইসিন এবং আরও নানা ধরনের অ্যাণ্টি-বায়োটিক এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ. **অ্যালকিলেটিং এজেণ্ট ঃ** এদের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কাজ মাইটোসিস বা সমবিভাজন পদ্ধতিতে ক্যানসার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা। অ্যাল-কিলেটিং এজেণ্টের কয়েকটির নাম করলে প্রথমেই নাইট্রোজেন মাস্টার্ড, থায়োবুসালফান ইত্যাদির কথা বলতে হয়।

গ. **হর্মোন ঃ** বিশেষ করে স্টেরয়েড হর্মোন। বিজ্ঞানীদের মতে, ক্যানসার দমনে এদের কার্যপদ্ধতি বিচিত্র। স্টেরয়েড হর্মোন রোগীর দেহে বিভিন্ন হর্মোনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ক্যানসার কোষ সাধারণ কোষে পরিবর্তিত হয়। স্তন ও প্রস্টেট গ্রন্থির সক্রিয়তা রুখতে এর গুরুত্ব অনেক।

বর্তমানে স্তনের ক্যানসারের রোগীদের ওপর এ-টেস্টোলোলাকটোন (A-Testololactone) নামে টেস্টোস্টেরন-ধর্মী রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গিয়েছে। এ-টেস্টোলোলকটোনের ক্রিয়া মোটেই হর্মোনের মত নয়। তবে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স নিসৃত কর্টিজোন (cortisone) স্তনের ক্যানসারের চিকিৎসায় বেশ ফলপ্রসূ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এর নাকি মারক টিউমারের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। আর পুরুষের স্তনের ক্যানসার রুখতে তো হর্মোনের সুষম ভারসাম্যই প্রধান পথ। শুধু শুক্রাশয় অপসারণের দ্বারাই প্রায় ৯০ শতাংশ রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। তাঁরা সুস্থ থাকবেন প্রায় দুবছর। অ্যাড্রেনাল অথবা পিটুইটারি ছেদনেও ভালো ফল পাওয়া

যায়। সর্বোপরি ইস্ট্রোজেন বিরোধী বা অ্যাণ্টিইস্ট্রোজেনিক কার্য পদ্ধতি স্তনের ক্যানসার প্রতিরোধে বেশি কার্যকর। পুরুষের প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যানসার একটি সাধারণ ঘটনা। এক্ষেত্রেও শুক্রাশয় অপসারণের পর ইস্ট্রোজেন ইনজেকশন দিয়ে ৯০ শতাংশ রোগীকে সাময়িক সুস্থ করে তোলা সম্ভব। পিটুইটারি ও অ্যাড্রেনাল ছেদনে এ রোগের প্রাবল্য বহুলাংশে কমে যায়। জরায়ুর ক্যানসারে ভুগছেন এমন শতকরা ৫০ জন রোগীকে প্রজেস্টেরন প্রয়োগে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সার্বিক বিচারে স্তন, প্রস্টেট, জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গের ক্যানসার নিয়ন্ত্রণে হর্মোনের সুষম ভারসাম্যই আমাদের প্রধান অস্ত্র।

মহিলা ক্যানসার জগতের শতকরা ৯ ভাগই অধিকার করে রয়েছে স্তন ক্যানসার। গত ৪০-৪৪ বছরে বিশ্বে মৃত মহিলার এক বিরাট অংশ ছিলেন স্তন ক্যানসারের রোগী। বিজ্ঞানীদের অভিমত মহিলাদের নিজেদের স্তনের সামান্যতম পরিবর্তনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার। ওঁদের ধারণা, এজন্য প্রাথমিকভাবে স্ব-পরীক্ষা বা সেলফ্-এগজামিনেশন-এর মাধ্যমে স্তনকে পরখ করতে পারলে সেটাই হবে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। এই ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে ঃ এক, সব বয়সের মেয়েদের এই পরীক্ষার দরকার নেই। ৩৫-৪০ বৎসর থেকে পরীক্ষাটা শুরু করা যেতে পারে। দুই. স্তনের ক্যানসারের ইতিহাস পাওয়া গেছে এমন বংশের মহিলা, অবিবাহিতা, দেরি করে বিয়ে করেছেন এমন মহিলার একটু বিশেষ সচেতন হওয়া দরকার। তিন, পরীক্ষা মাসে একদিন করতে পারলেই যথেষ্ট। পরীক্ষাটা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। স্পষ্ট করে বললে অর্থ এই হয়, পরীক্ষাটা যেন আবার বাতিকে পরিণত না হয়। কোন মহিলা প্রাথমিক এই পরীক্ষায় পিণ্ড বা লাম্পের আঁচ পেলেই দেরি না করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। হাসপাতাল বা ক্লিনিকে কায় পরীক্ষা ছাড়াও থার্মোগ্রাফি, ম্যানোগ্রাফি নামে দু-ধরনের পরীক্ষা করা হয়। এরপর নিশ্চিত ধারণা পাবার জন্যে বায়োপ্সি করা প্রয়োজন। এতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পিণ্ডের স্বরূপ ফুটে ওঠে। এই লেখকের মতে, আমাদের দেশে প্রায় ৮০ শতাংশ স্তনের পিণ্ডই ক্যানসার সম্পর্কিত নয়।

ঘ. **উপক্ষার বা অ্যালকলয়েড ঃ** ভিনব্লাসটিন ও ভিলক্রিসটিন নাম দুটি খুব একটা পুরানো নয়। এরা মাইটোসিস পদ্ধতির দ্বারা ক্যানসার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির তীব্র বিরোধী। পুরুষের স্তনের ক্যানসারও উক্ত উপক্ষার দুটি দ্বারা শক্ত হাতে দমন করা যায়। বর্তমানে ভিনব্লাসটিন সালফেট ও

ভিনক্রিসটিন সালফেট নামের এই দুই ক্যানসার বিরোধী পদার্থ ভারতে বেশ জনপ্রিয়। বোম্বেতে জোর কদমে ওষুধ দুটি উৎপাদন হচ্ছে। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে পুনার ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি (NCL)। এটি দিল্লির কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR) এর একটি শাখা। প্রকৃতভাবে ওষুধ দুটি ডাইমেরিক অ্যালকালয়েড। এগুলি শুকনো ক্যাথার্যানথাস রোসেয়াস (C. Roseus) বা ভিনকো রোসেয়ার পাতা থেকে তৈরী। মারাঠি ভাষায় গাছটি সদফুলি নামে পরিচিত। সাধারণ ভাবে ওষুধ দুটি কিছু বিশেষ ধরনের ক্যানসারের প্রতিকারে বেশ কার্যকরী। যেমন, হজকিন (Hodgkin) বর্ণিত রোগ, লিম্ফোমা এবং কোরিও কার্সিনোমার চিকিৎসায় ভিনব্লাসটিন বেশ উপযোগী। অন্যদিকে ভিনক্রিসটিন লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যানসার (শিশুদের ক্ষেত্রে) নিরাময়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। দুটি ওষুধই আগে আমেরিকা ও হাঙ্গেরি থেকে আমদানি করা হত। এতে খরচ পড়ত বছরে বেশ কয়েক লাখ। মজার কথা হচ্ছে, আমেরিকা ও হাঙ্গেরি এই দুয়ের কোন দেশেই কিন্তু আগে গাছটি (সি. রোসেয়াস) পাওয়া যেতনা। কিন্তু ওষুধ ঠিক তৈরী হয়ে যাচ্ছিল। সে গাছ তারা পেত ভারত থেকেই। ভারতই ছিল তখন গাছটির একমাত্র রপ্তানিকর্তা। বর্তমানে ভারতের বিভিন্নস্থানে (বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে) গাছটির ব্যাপক চাষের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর উৎপাদন চলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের রপ্তানি আগের তুলনায় এখন অনেক কম।

৬. ইণ্টারফেরন শব্দটি এখনো আমাদের সকলের কানে পেঁছায়নি। আশা করা যায়, কিছুদিনের মধ্যেই পেঁছিবে। ক্যানসার চিকিৎসায় বিজ্ঞানের দেওয়া সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হাতিয়ার এই ইণ্টারফেরন। আশ্চর্য এর কার্যপদ্ধতি বিজ্ঞানীদেরও একসময় ভাবিয়ে তুলেছিল।

ইণ্টারফেরন একটি প্রোটিন। এটি ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করে। ক্যানসারের শক্তিশালী প্রতিবন্ধক। স্তন্যপায়ী প্রাণীদেহে কিছু বিশেষ কোষের ক্রিয়াকলাপে ইণ্টারফেরন তৈরী করা হয়। তবে এভাবে তৈরী হয় খুবই অল্প। বিজ্ঞানীরা তাই স্তন্যপায়ী প্রাণীদেহে ইণ্টারফেরন সৃষ্টিকারী সেই বিশেষ কোষগুলি বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। অবশ্য স্বপ্নটির সার্থক রূপায়ণ এখনও সম্ভব হয়নি। ইণ্টারফেরন আবিষ্কার নিয়ে একটি ছোট্র অথচ সুন্দর ইতিহাস আছে। ১৯৫৭ সলে আইজ্যাক ও লিণ্ডেলম্যান নামে দুই ভাইরাস বিশেষজ্ঞ লণ্ডনের

হসপিটাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস নিয়ে কাজ করছেন। তাঁরা মুরগির ডিমের খোলার একটি পাতলা পর্দাকে প্রথমে একটি পরিপোষক দ্রবণে (nutrient soln.) রাখা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসপূর্ণ মাধ্যমে ছেড়ে দিলেন। পরে সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসপূর্ণ দ্রবণের পরিবর্তন ঘটানো হল। এখন এতে রাখলেন নতুন ধরনের ভাইরাস। এবার বিজ্ঞানীরা একটি দারুণ ঘটনা লক্ষ্য করলেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ডিমের পাতলা পর্দায় কোন সংক্রমণ লক্ষ্য করা গেল না। তাঁরা সিদ্ধান্তে আসলেন প্রথম ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রামণই দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে ডিমের পাতলা পদার্থকে রক্ষ করেছে। তাঁদের মতে, সেই পাতলা পর্দায় এমন এক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল যা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করেছে ঃ উৎপাদিত বিশেষ পদার্থটি এখানে দ্বিতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি বাধা অর্থাৎ 'interference'। ঘটনাটির নাম ভাইরাস ঘটিত বাধা বা 'Vital interference'। আর পদার্থটির নাম হল ইন্টারফেরন।

ভিলেজেলিফ-এর ফ্রেঞ্চ ক্যানসার ইনস্টিটিউটের আয়ন গ্রেসার ইঁদুরের দেহে ইন্টারফেরনের গুরুত্বপূর্ণ ক্যানসার বিরোধী কার্যকলাপের কথা আমাদের অনেকদিন আগেই জানিয়েছেন। পরে স্টকহমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের হান্স স্ট্যানডার বলেন, এর কার্যকলাপ মানুষেও বেশ প্রবল। ইন্টারফেরন নেননি এমন রোগীকে ইন্টারফেরন নেওয়া রোগীর তুলনায় রোগ নির্ণয়ের প্রায় ৫ বছর পর অন্তত শতকরা ৭৫—১০০ ভাগ মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। ইন্টারফেরন ক্যানসার কোষের বিভাজন ক্ষমতা নষ্ট করে। ক্যানসার কোষের বিস্তৃতিকে ভীষণভাবে বাধা দেয়। এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উদ্দীপিত ও শক্তিশালী করে। এর দ্বারা বিভিন্ন বহিরাগত জীবাণুকে ধ্বংস করার কাজকে অনেক এগিয়ে দেয়। দেখা গেছে, লিম্ফোসাইটে তৈরী ইন্টারফেরন অন্যান্য শ্বেতকণিকা ও ফাইব্রোব্লাস্ট-এ তৈরী ইন্টারফেরনের থেকে বেশী কার্যকর। হানস্ স্ট্যানডারের মতে, হাড়ের ক্যানসার (osteo sarcoma) রুখতে ইন্টারফেরন তুলনাহীন। এ রোগে ভুগছে এমন রোগীর প্রায় ৮০ শতাংশই মারা গেলেন গত দু'বছরে। আশার কথা হল, ইন্টারফেরন প্রয়োগে প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি রোগীকে এখন বাঁচিয়ে তোলা যাচ্ছে। তাঁরা সুস্থ থাকবেন প্রায় ৫ বছর বা তারও কিছু বেশি। শুধু কি হাড়ের ক্যানসার? স্তনের ক্যানসার, একাধিক মজ্জা-টিউমার বা মায়েলোমা এবং

লিউকেমিয়াতে ইণ্টারফেরনের প্রয়োগ করা হচ্ছে। ক্যানসারের অগ্রগতি ঠেকাতে এর প্রয়োগ এখন ব্যাপক। বিশ্বের ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্রগুলির কাজকর্মের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই ইণ্টারফেরন। যেমন— আমেরিকার ক্যানসার সোসাইটি। ক্যানসারের গবেষণা চালাতে এরা ব্যয় করে চলেছে বহু বহু মিলিয়ন ডলার। তাদের গবেষণা চলে প্রধানত বিভিন্ন ধরনের মায়েলোমা, লিম্ফোমা, মেলানোমা ও স্তনের ক্যানসার নিয়ে। এছাড়া লিউকেমিয়া এবং চামড়া, ফুসফুস ও পাকস্থলীর ক্যানসার, এমন কি লিম্ফোমা ঠেকাতে ইণ্টারফেরনের ভূমিকা কী, এ নিয়ে চলছে ব্রিটিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের গবেষণা। প্রযুক্তি বিদ্যায় শীর্ষস্থানাধিকারী দেশগুলির মধ্যে জাপান, ফ্রান্স বা পশ্চিম জার্মানিও ইণ্টারফেরন নিয়ে ক্যানসার গবেষণার কোন অংশে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। তাদের প্রচেষ্টা এখন হেপাটোমা ও অস্টিও-সারকোমার প্রতিকার নিয়ে।

কিছু বিজ্ঞানীর মতে, ইণ্টারফেরন ব্যবহারে রোগীর দেহে কয়েকটি খারাপ প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে। আপাতত এর ব্যবহার সম্পর্কে তাই চূড়ান্ত কিছু ভাবা হয়নি। তারা বলেন, ইণ্টারফেরনের বিকল্প হিসেবে নাকি প্রতিষেধকের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে পলিরিবোনিউক্লিওটাইড। এটি দেহে ইণ্টারফেরন ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এতেও দেহে কতগুলি কুপ্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এসব সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানীরা ইণ্টারফেরনের গুরুত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, যে কোন ভাইরাস ঘটিত রোগের ক্ষেত্রেই ইণ্টারফেরন চমৎকার কাজ করে। তাঁরা বলেন, ক্যানসার চিকিৎসায় ইণ্টারফেরন বিপ্লব আনার ক্ষমতা রাখে। তবে সরকার পক্ষ অগ্রণী না হলে এই বিপ্লব সম্ভব নয়। তার কারণ, ইণ্টারফেরন খুবই মহার্ঘ পদার্থ। এক পাউণ্ড ইণ্টারফেরনের মূল্য ১০—২০ মিলিয়ন ডলার। আমাদের দেশের বেশির ভাগেরই জীবনযাত্রা দারিদ্র্য সীমার নিচে ; ইণ্টারফেরন ব্যবহারের কথা তাদের চিন্তারই অতীত। সুযোগ নেওয়াতো আরও অনেক পরের ব্যাপার।

চ **রেডিও-কেমোথেরাপি ঃ** ক্যানসার প্রতিকারে এটিও পিছিয়ে নেই। মিসোনিডেজল ঠিক এই ধরনের একটি ওষুধ। নেংটি ইঁদুরের ক্যানসার নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। মানুষের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

(৯) **সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ :**

উপরে বর্ণিত গবেষণা প্রকল্পগুলি ছাড়াও ক্যানসার প্রতিরোধে বিজ্ঞানের অন্যান্য সম্ভাবনাময় দিকগুলি নিচে একে একে তুলে ধরা হচ্ছে :

১ **মস্তিষ্কের ক্যানসার :** সারা পৃথিবীতে প্রতিবছর হাজার হাজার লোকের মস্তিষ্কের ক্যানসারে মৃত্যু হচ্ছে। এ রোগে বাঁচার হার অন্য যে কোন অঙ্গের ক্যানসারের তুলনায় কম। মস্তিষ্কে ক্যানসার হয়েছে এমন রোগীর দেহে একটি পাম্প বসিয়ে তার সাহায্যে অবিরাম শক্তিশালী মাত্রায় উপযুক্ত ওষুধ শরীরে পাঠিয়ে তার সুফল পাওয়া গেছে। এই পাম্পটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। তবে ফল বেশ উৎসাহ ব্যঞ্জক। নিউরোসার্জারির অধ্যাপক ডঃ উইলিয়াম চাণ্ডলা'র মতে, এই পদ্ধতি সম্পর্কে আগে থেকেই নিরাময়ের কথা বলা সম্ভব নয়। তবে রোগীর আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্পর্কে তিনি আশ্বস্ত করেন। তাঁর গবেষণা চলে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কয়েকজনের সাহচর্যে। চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকা "নিউরোসার্জারি"-তে তাঁর গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। পাম্পটি রোগীর বুকে বা উদরে ত্বকের নিচে সেলাই করে বসিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সেটি মস্তিষ্ক অথবা বৃহৎ রক্তবাহী নালী ক্যারোটিড ধমনী পর্যন্ত প্রসারিত একটি নলের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী টিউমার বিধ্বংসী ওষুধ ফোঁটা ফোঁটা করে অবিরাম মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়। ক্যারোটিড ধমনীর অবস্থান ঘাড়ের ঠিক পাশে। এর মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালিত হয়। পাম্পের মারফৎ নির্দিষ্ট ওষুধ টিউমারে পেঁীছে কেন্দ্রীভূত হয়। সাধারণ রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের চেয়ে এ'টি হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। সাধারণ রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের মত এ-ওষুধ সারাদেহে সঞ্চারিত না হয়ে সরাসরি মস্তিষ্কে পেঁীছে যায়। অবশ্য তার জন্য কিছু প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে। চাণ্ডলার বলেছেন, দুটি ভিন্ন ধরনের মস্তিষ্কের ক্যানসারে আক্রান্ত ১৮ জন রোগীর ওপর প্রথমদিকে পরীক্ষা চালিয়ে এই চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গেছে। রোগীদের একজন ছিলেন মিশিগানের ফেনটন থেকে আগত ২৪ বছর বয়সী যুবক। নামক—গ্লন সোয়র্ভস। চাণ্ডলারের গবেষণার সঙ্গে জড়িত থাকতে পেরে তিনি খুশী। সম্প্রতি আবিষ্কৃত এই পাম্পটি ইতিমধ্যে কোন কোন যকৃতের ক্যানসার চিকিৎসাতেও ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকায় ৮৫টিরও

বেশি চিকিৎসা কেন্দ্রে যকৃতের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় এই পাম্পটি ব্যবহার করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, কোলন ও মলদ্বারে ক্যানসার চিকিৎসাতেও এটি কাজে আসবে। এ নিয়ে এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

২. **লিভার-ক্যানসার ঃ** সাধারণত মানুষের হয় এমন প্রধান ১০ রকমের ক্যানসারের মধ্যে লিভার-ক্যানসার অন্যতম। প্রতি বছর পৃথিবীতে এ রোগে প্রায় ২ লক্ষ ৫ হাজার মানুষ মারা যায়। জেনেভায় ১৬টি দেশের ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা মিলিত হয়ে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্পর্কে একমত হন। তা হল, এক ধরনের টিকা প্রয়োগ করে শতকরা ৮০ ভাগ লিভার ক্যানসারের রোগীকে ভালো করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় দু'লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচবে। দেখা গেছে, লিভার ক্যানসারের রোগীদের লিভারে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস বাসা বাঁধে। বিজ্ঞানীরা এরোগের জন্য এদেরই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করেছেন। এও দেখা গেছে, যাদের ঐ ভ্যাক্সিন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা আর এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন না। তাদের শরীর ঐ ভাইরাস প্রতিরোধে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পশ্চিম আফ্রিকা, বার্মা ও চীনের জনগণের ওপর এই টিকা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছে। আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে এর প্রয়োগ শুরু হবে।

৩. **পি. এফ প্রোটিনের ভূমিকা ঃ** হাভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডঃ জে. ফকম্যান রক্ত থেকে এক ধরনের প্রোটিন আবিষ্কার করেছেন। প্রোটিনটির নাম—'পি- এফ'। পুরোনাম, প্লেটলেট ফ্যাক্টর—৪। এই প্রোটিন ক্যানসার টিউমারের ভিতর যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্ত জালিকা খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ মারফৎ টিউমারের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, তাদের শুরুতেই নষ্ট করে দিতে পারে। ফলে টিউমারের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। টিউমারের মধ্যে এই ধরনের রক্ত জালিকার বৃদ্ধিকে বলে 'অ্যানজিয়ের জেনেসিস'। ডঃ ফকম্যানের মতে ক্যানসার টিউমারের গঠনের প্রথমদিকে টিউমারের বৃদ্ধি বেশ দ্রুত। তাই তিনি প্রথম অবস্থাতেই পি. এফ প্রোটিন প্রয়োগের কথা বলেছেন। ইঁদুরের কান, ফুসফুস ইত্যাদি স্থানে টিউমারের ওপর এই প্রোটিন প্রয়োগ করে তিনি আশাপ্রদ ফল পেয়েছেন বলে দাবি করেন।

৪. **নতুন রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ঃ "এলিসা" ঃ** কেমব্রিজের ছোট এক কোম্পানি এর মধ্যেই ক্যানসার নির্ধারণের এক পদ্ধতি বের করেছেন। এর নাম 'এলিসা' (ELISA)। পুরোনাম - এনজাইম লিংক্ড্ ইমিউনো

সরবেণ্ট অ্যাসে (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)। এর কার্য পদ্ধতি বিস্ময়কর। এই পদ্ধতিতে অ্যাণ্টিজেন-অ্যাণ্টিবডি পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন এক ধরনের রং-কে রোগ নির্ধারণের মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়। রোগটি অবশ্যই ক্যানসার।

৫. **রঞ্জন পদ্ধতিতে প্রাক-ক্যানসার নির্ণয়ঃ** ক্যানসার গবেষণা নিয়ে কত নতুন নতুন মজার ঘটনাই না ঘটছে। ফালগে (Falge) বিক্রিয়ায় কোষের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিক অ্যাসিড রঞ্জিত হয়। দেখা গেছে, একেবারে শুরুতে ক্যানসার কোষের নিউক্লিক অ্যাসিড সাধারণ কোষের নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে প্রায় ২—৩ গুণ বেশি রঞ্জিত হয়ে থাকে। সন্দেহ নেই ঘটনাটিতে নতুনত্ব আছে। লণ্ডনের কুইন এলিজাবেথ কলেজের ডঃ অ্যানড্রুসিন কক এবং ডঃ জেমি ডলটন এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে আরও সূক্ষ্ম এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর ফলে ক্যানসার শুরু হওয়ার আগে থেকেই বলে দেওয়া যাবে ভবিষ্যতে ক্যানসার হওয়ার সম্ভবনা আছে কিনা। এই পদ্ধতিতে মাইক্রোসকোপ, স্পেকট্রোফোটোমিটার ও মাইক্রোকম্পিউটার এই তিনটি যন্ত্রকেই একসঙ্গে কাজে লাগানো হয়। ফলে অস্বাভাবিক রং-এর নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষগুলিকে সহজে চিনে ফেলা যায়। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্যানসারকে অনেক আগে থেকেই ধরে ফেলা যাবে। চিকিৎসা হবে আগের থেকে অনেক বেশি সহজ।

৬. **বীজের প্রতিরোধী ভূমিকাঃ** বিভিন্ন শস্যের বীজ ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ধান, দানাশস্য, মটর দানার কথা বলা যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পাখির বুঝি সেই কারণেই ক্যানসার কম হয়। বীজে কয়েক ধরনের উৎসেচক থাকে। এগুলি প্রকৃতিতে প্রোটিওজ দমনকারী উৎসেচকের মতো। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ওয়ালটার ট্রল-এর মতে ঐ উৎসেচকগুলি নেংটি ইঁদুরের মেলানোমা প্রতিরোধে অংশ নেয়। এছাড়া লিভার, কোলন এমন কি স্তনের ক্যানসারও প্রতিরোধ করে। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে যাঁরা খাদ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বীজ নিয়মিতভাবে গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ক্যানসারের হার নাকি কম। তবে কিভাবে বীজগুলি ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে সেটা আজও পরিষ্কার নয়। পরীক্ষাগুলি চালানো হয়েছিল নেংটি ইঁদুরের ওপর।

৭. **নতুন ওষুধঃ** সম্প্রতি এক সোভিয়েত বিজ্ঞানী এমন একটি ওষুধ তৈরী করেছেন যেটি শুধু টেকোমাথায় চুল গজাতেই কার্যকর নয়, ক্যানসারেও

যথেষ্ট ফলপ্রসূ। ওষুধটি সিলিকন যুক্ত এক জাতীয় যৌগ। আর বিজ্ঞানীটির নাম—ভোরেনকভ।

ইতিমধ্যে আবার রাশিয়ার অন্য এক বিজ্ঞানী আমাদের অদ্ভূত কয়েকটি কথা শোনালেন। তিনি বলেছেন, ক্যানসারে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা আক্রান্ত হলেও এক ধরনের হাঙ্গর এ রোগের শিকার হয় না। বরং তারা ক্যানসারের প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। এমন কি কৃত্রিমভাবেও এদের দেহে ক্যানসার সৃষ্টি করা যায় না। কারণ এসব হাঙ্গরের কোষ থেকে বেরিয়ে আসে একজাতীয় রাসায়নিক যৌগ। যৌগটি শুধু যে টিউমার গঠনে বাধা দেয় তাই নয়, তাকে বিপরীত-মুখীও করে তোলে। তবে যৌগটির সঠিক উপাদান এখনো জানা যায়নি। রাশিয়ার মৎস্য চাষ ও সমুদ্রতত্ব গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভিক্টর গানদেল হাঙ্গরের এই ক্যানসার প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা বলেছেন। তাঁর ধারণা হাঙ্গরের দেহে প্রাপ্ত এই রাসায়নিক যৌগ যদি মানুষের কাজে লাগে তবে তা বহু মানুষকে ক্যানসারের হাত থেকে বাঁচার পথ দেখাতে পারবে।

৮. **জাপানী ওষুধ লিপিডা :** প্রযুক্তি বিদ্যায় বিশ্বে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জাপান ক্যানসার গবেষণাতেও পিছিয়ে নেই। কথাটি প্রমাণ করে তাদের ক্যানসার গবেষণার অগ্রগতি ও তার ফল। জাপানের কয়েকজন বিজ্ঞানী গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ক্যানসার প্রতিরোধে নতুন ওষুধ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। ওষুধের নাম লিপিডা। কোলন সালমোনেল্লার তৈরী অন্তঃবিষ বা এণ্ডকসিনের মধ্যে রয়েছে লিপিডা। লিপিডা শুধু যে ক্যানসার কোষ-গুলির বৃদ্ধি ঠেকাবে তা নয়, এটি দেহে ক্যানসার প্রতিরোধী ক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে। জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা করে জাপানের বিজ্ঞানীরা এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বলে প্রধান গবেষক প্রখ্যাত রসায়ন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শিবিতা জানিয়েছেন।

৯. **ক্যানসার চিকিৎসায় প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন :** ব্যাপারটি অনেকের কাছে নতুনই বটে। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন কলাকোষ থেকে নিঃসৃত এক ধরনের অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। হর্মোনের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে এদের মিল আছে। অন্যান্য কাজ ছাড়াও এর ক্যানসার বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা বিজ্ঞানীদের নজর কেড়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে প্রস্টাগ্ল্যানডিনের এক অত্যাশ্চর্য গুণের কথা প্রমাণিত হয়েছে। এটি ক্যানসার কোষকে সাধারণ কোষে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা রাখে। তবে এর কয়েকটি কু-প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা

এখনো বেশ সন্দিগ্ধমনা। তাঁদের ধারণা, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন কোন কোন অবস্থায় স্তন প্রস্টেট ও জরায়ুর ক্যানসারকে ত্বরান্বিত করে।

১০. **রুডিয়া করডিফোলিয়া** : শব্দটি সম্ভবত অনেকের কাছেই নতুন। এটি পাহাড়ী এলাকায় এক অতি পরিচিত গাছ। মহারাষ্ট্র ও তার আশেপাশের রাজ্যগুলিতে এর পরিচিত 'মনজিস্তা' নামে। বোম্বের ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কেমোথেরাপি বিভাগের এম. পি. চিটনিস তাঁর কিছু সহযোগীর তৎপরতায় এই গাছের ক্যানসার বিরোধী কার্যকারিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ল্যাবরেটারিতে কয়েকটি ক্যানসারাক্রান্ত ইঁদুরের দেহে এই গাছের নির্যাস ঢুকিয়ে সুফল পাওয়া গেছে। এতে নেংটি ইঁদুরগুলির মিনিমাম সারভাইব্যল্ টাইম (MST) বা বেঁচে থাকার ন্যূনতম সময় বেড়ে প্রায় ১'৬৫—১'৮৩ শতাংশ পর্যন্তও হতে দেখা গেছে। তবে এর ব্যবহারে আদৌ কোন কুফল আছে কিনা সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন।

১১. **ধাতব যৌগ** : আমরা বিভিন্ন ধরনের যৌগকে অনেক সময় বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা শুনেছি। ক্যানসারে ব্যবহৃত ধাতব-পদার্থটির নাম প্লাটিনাম। বেশ মূল্যবান পদার্থ। এর এক ধরনের যৌগকে বিজ্ঞানীরা ক্যানসার নিরাময়ে ব্যবহারের জন্যে সুপারিশ করেছেন। যৌগটির নাম সিস্ ডি. ডি পি। পুরো নাম-সিস্ ডাই অ্যামিনো ডাইক্লোরো প্লাটিনাম। বিজ্ঞানীরা একে ক্ষমতাশালী ক্যানসার বিরোধী ওষুধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যৌগটি ক্যানসার কোষের DNA অণুর গুয়ানিন নামের নাইট্রোজেন ঘটিত বেসের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পুনরায় DNA অণুর পরিমাণ বৃদ্ধি রোধ করে। এখানে প্লাটিনাম যৌগের দ্বারা এই অস্বাভাবিক DNA-র বৃদ্ধি রোধ পরোক্ষ-ভাবে ক্যানসার কোষেরও বৃদ্ধি রোধ করে। ফলস্বরূপ ক্যানসার কোষ বিনষ্ট হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যাপারটি এখনো গবেষণাধীন। গবেষণা করছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিফেন লিপার্ড ও জন ক্যারাডোনা এবং কেম্ব্রিজের মাইকেল ক্রেইচ ও মহিন্দর সিং।

১২. **ক্যানসার চিকিৎসায় লেসার রশ্মি** : তবে কি ক্যানসারের অধুনিকতম প্রতিকার লেসার? লেসার (LASER) শব্দটি অনেক দিন থেকেই আমরা শুনে আসছি। আমেরিকার এক বিজ্ঞানী এই রশ্মি আবিষ্কার করেন। ভারতে লেসার পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার আশা করা যায় এ বছরই চালু হবে। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসায় ছুরি ব্যবহার করতে হয় না। দেখা গেছে, লেসার রশ্মি প্রয়োগে

ক্যানসার কোষগুলির গোড়া খুবই সরু হয়ে যায়। ফলে কোষগুলি মরে যায়। আমেদাবাদের গুজরাট ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান শল্য চিকিৎসক ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডঃ দেবেন প্যাটেল বলেছেন, ক্যানসার রোগীদের কথা চিন্তা করে কিছুদিনের মধ্যেই লেসার পদ্ধতিতে শল্যচিকিৎসা শুরু হবে। ডঃ প্যাটেল সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানি গিয়ে এ ব্যাপারে সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে এসেছেন। এছাড়াও নতুন মেডিলাস লেসার কয়েকটি বিশেষ ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসায় খুবই কার্যকর।

১৩. **বর্তমানে রক্তের ক্যানসার বা লিউকেমিয়া প্রতিকারে** CSF (Colony stimulating factor) **বেশ সাড়া জাগিয়েছে।** CSF একধরনের প্রোটিন (natural body protein) এরা শ্বেতকণিকা (WBC) তৈরীর প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে। তাই লিউকেমিয়া প্রতিরোধে এর ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে। এও দেখা গেছে, এর ব্যবহারে ক্যানসারের প্রকারভেদও করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের পার্থক্য করতে ক্রোমোজোমের প্রকৃতিকে মানদণ্ড ধরা হয়। CSF নানা রকম ক্যানসারের ক্রোমোজোমের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরে। সম্প্রতি জিন প্রযুক্তির প্রয়োগে ব্যাপক CSF প্রস্তুতির কথা ভাবা হচ্ছে। ভবিষ্যতে রক্তের ক্যানসার প্রতিরোধে CSF এক শক্তিশালী হাতিয়ার বলে বিজ্ঞানীদের আশা।

পর্ষদ প্রকাশিত বিজ্ঞান পুস্তিকামালার কয়েকটি

১। **ভাসমান জলজ উদ্ভিদ**/বিজন কুমার মণ্ডল ও মনোজরঞ্জন ঘোষ/**১১·০০**
২। **জীব বিবর্তনের ইতিহাস**/প্রসাদরঞ্জন রায় ও আনন্দ ঘোষ হাজরা/**২৩·০০**
৩। **ক্রীড়া চিকিৎসা**/সুনীল ঠাকুর/**২০·০০**
৪। **শিশু কেন শিশু**/অসীম বর্ধন/**১৩·০০**
৫। **বহুমুখী মাপকাঠিতে কর্মসিদ্ধান্ত**/বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়/**১০·৫০**
৬। **বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে**/অজিত চৌধুরী/**৭·০০**
৭। **নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র** / সুশীল ঘোষ/**১২·০০**
(নরসিং দাস পুরস্কার প্রাপ্ত ১৯৮৬)
৮। **অতিশৈত্যের কথা**/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/**৭·০০**
৯। **পরিবর্তী প্রবাহ**/সুবীরকুমার ঘোষ/**৭·০০**
১০। **বাস্তবসংখ্যা ও সংহতিতত্ত্ব**/প্রদীপকুমার মজুমদার/**১০·০০**
১১। **আমাদের দৃষ্টিতে গণিত**/প্রদীপকুমার মজুমদার/**৭·০০**
১২। **ক্যাকটাস ও ফুলচাষ**/বলাইলাল জানা/**১২·০০**
১৩। **শুষ্ক ও খরা এলাকার চাষ পদ্ধতি**/বিমল বিহারী দাস ও বলাই লাল জানা/**১৮·০০**
১৪। **সয়াবিন**/দ্বিজেন গুহবক্সী/**৯·০০**
১৫। **অম্লমাটি ও তার তত্ত্বাবধান**/দিলীপকুমার দাস ও দীপঙ্কর সাহা/**১০·০০**
১৬। **এফিড্ বা জাবপোকা**/মনোজরঞ্জন ঘোষ/**১২·০০**
১৭। **শক্তি : বিভিন্ন উৎস**/অমিতাভ রায়/**৭·০০**
১৮। **গঙ্গাপথের ইতিকথা**/অশোককুমার বসু/**১৬·০০**
১৯। **সন্ধান**/সঙ্কর্ষণ রায়/**৭·০০**
২০। **আবহাওয়া ও আমরা**/অপরাজিত বসু/**১০·০০**

সাত টাকা